পরাজিত

শিবতোষ ঘোষ

www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পূর্বকথা

'শয়তান' উপন্যাসের পিছনে যে ব্যক্তিগত ইতিহাসের সন্ধান-সূত্র মেলে, তা থেকে টলস্টয়ের আত্মচরিত্রের ও নৈতিক বিশ্বাসের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। গোড়ার কথা হিসেবে তাই এই উপন্যাসখানির পৃষ্ঠপট বা প্রাক-কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হল ।

১৮৮০ সালের শেষ ভাগ।

টলস্টয়ের বয়স তখন বাহান্ন...

ইয়াস্‌নায়া পোলিয়ানা অঞ্চলে টলস্টয়ের বাড়িতে থেকে একজন অল্পবয়সী মাস্টার তাঁর ছেলেদের পড়াশুনোর তত্ত্বাবধান করতেন।

একদিন খুব উত্তেজিত অবস্থায় টলস্টয় তাঁর কাছে দৌড়ে এলেন। বললেন, 'আমার একটা উপকার করতে হবে তোমায়...'

টলস্টয়কে এতখানি বিচলিত হতে মাস্টার মহাশয় দেখেন নি কোনো দিন। তাই সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এসে বললেন,—'বলুন কী করতে পারি... ? আমার দ্বারা যেটুকু সম্ভব.....'

স্খলিত কণ্ঠে টলস্টয় বলে উঠলেন :

'বাঁচাও আমাকে ! আমি তলিয়ে যাচ্ছি..'

'কিন্তু ব্যাপারটা কী হয়েছে, বলুন আগে...'

টলস্টয় তখন খুলে বললেন :

'একটা দুর্দম যৌন-আকাঙ্ক্ষা আমার মন আর শরীরকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কিছুতেই সামলাতে পারছি না নিজেকে...মনে হচ্ছে—কোনো শক্তি নেই আমার...এই প্রলোভন জয় করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তুমি আমায় সাহায্য করতে পারো।'

গৃহশিক্ষক বললেন :

'কিন্তু কীভাবে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি, সেইটা বুঝতে পারছি না। কারণ আমি তো নিজেই দুর্বল... !'

'তুমি পারো—নিশ্চয়ই পারো, যদি-না ইচ্ছে করে এড়িয়ে যাও.....'

'বেশ, বলুন কী করতে হবে...আমি রাজি।'

'বাঁচালে তুমি !' টলস্টয় নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

'রোজ আমি হেঁটে বেড়াই, তুমি তখন আমার সঙ্গে এসো। দু-জনে একত্র বেড়ালে, কথা বললে, প্রলোভনের চিন্তা আর মাথায় ঢুকবে না...আমি ছাড়া পাব। আসবে তো ?'

দু-জনে বেরুলেন বেড়াতে। পথে যেতে-যেতে এ-কথা সে-কথায় টলস্টয় সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললেন তাঁর ভ্রমণ-সঙ্গীকে।

ইতিপূর্বে, টলস্টয় যখন বেড়াতে বেরোতেন, তাঁর চোখে পড়ে যেত ডোমনা বলে একটি যুবতী মেয়েকে...বছর বাইশ বয়স হবে তার। চাকর-বাকরদের রাঁধুনি হিসাবে তাকে কাজে ভর্তি করা হয়েছিল কিছুদিন আগে।

এই ডোমনা মেয়েটি বেশ লম্বা-চওড়া আর স্বাস্থ্যবতী। দেখতে তেমন বিশেষ সুশ্রী না হলেও তার অঙ্গে আছে মজবুত স্বাস্থ্যের নিটোল লাবণ্য। দেহের গঠন মনোহর, রঙটাও চমৎকার। একবার দেখলে ওর দিকে বার বার তাকাতে ইচ্ছে করে...

প্রথম কয়েকদিন ডোমনার সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেলে তিনি চোখ ফিরিয়ে নিতেন। কিন্তু অবাধ্য

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দৃষ্টি আবার গিয়ে নিবদ্ধ হত তার সুঠাম অঙ্গসৌষ্ঠবের ওপর। দূর থেকে লুকিয়ে-চুরিয়ে ওকে একদৃষ্টে দেখতে ভালোই লাগত তাঁর। ক্রমশ এই দেখাটা দাঁড়াল নেশায়। তখন আস্তে আস্তে ওর পিছু নিতে লাগলেন তিনি। ডোমনা যখন যেদিকে যায়, টলস্টয়ও তার অনুসরণ করেন। একটু আড়াল পেলেই শিস দেন, ইশারা করেন।

ক্রমশ ডোমনার সঙ্গে আলাপ হল তাঁর। ওর সঙ্গে কথা বলা, একত্র বেড়ানো ব্যাপারগুলো সহজ ও সাধারণ হয়ে এল। অবশেষে একদিন ওর কাছে প্রস্তাব করলেন, দু-জনে এক জায়গায় গিয়ে মিলবেন।

জায়গাটা তাঁর তালুকের মধ্যেই...একটু দূরে মেঠো পথ ধরে গেলে একটা পুরানো বাগানের কানাচে একটি নিভৃত-স্থান। ঠিক হল সেইখানে...

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেখানে পৌঁছাতে হলে ছেলেদের যে পড়বার ঘরটা ছিল বার-বাড়ির দিকে, তার পাশ কাটিয়ে যেতে হয়। সে-ঘরের জানালার ঠিক নিচ দিয়েই পথটা গেছে। পরের দিন সঙ্কেত-স্থলে চলেছেন টলস্টয়...

যাচ্ছেন আপন মনে...কিন্তু মনের মধ্যে তখন দারুণ ঝড় উঠেছে! দ্বিধায় আর দ্বন্দ্বে মন তাঁর দুলছে। একদিকে দেহ-তৃষ্ণার দুর্বার প্রলোভন আর অপরদিকে বিবেক-বুদ্ধি সংযমের প্রেরণা।

ঠিক সেই সময়টিতে তাঁর মেজ ছেলে পড়বার ঘরের জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে বাপকে ডেকে বলল :

'আজ যে কথা ছিল, তুমি আমায় গ্রিক পড়িয়ে দেবে! ভুলে গেছ...?'

চমক ভাঙল টলস্টয়ের। চৈতন্য ফিরে পেলেন যেন। ছেলেকে পড়াতে বসে গেলেন। আর যাওয়া হল না ডোমনার কাছে...আসন্ন বিপদের কবল থেকে এইভাবে বেঁচে গিয়ে তিনি মুক্তির নিশ্বাস ফেললেন। কিন্তু কতক্ষণের মুক্তি? কতটুকুই বা?

প্রলোভন পরাস্ত হয় নি। মাথা নিচু করেছিল মাত্র, কিছুক্ষণের জন্যে। আবার শুরু হল সেই আকস্মিক দ্বন্দ্ব আর বিক্ষোভ। উদগ্র কামনার তাড়নায় মন তাঁর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উঠল। ভক্তি ও বিশ্বাসে আস্থাবান হয়ে তিনি চেষ্টা করলেন প্রার্থনায় বসতে, যদি ধ্যান-ধারণায় মন আবার সরল সতেজ হয়ে দেহ-তৃষ্ণাকে অবদমিত করতে পারে...

কিন্তু হল না...মুক্তি পেলেন না টলস্টয়। নানা উপায়ে চেষ্টা করলেন মনকে ফেরাতে। দেহ-নির্যাতনে শরীর অবসন্ন হয় মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। মনের কোষের মধ্যে যে কীটাণু প্রবেশ করেছে, সেখানে কোনো প্রতিকার মেলে না। নিজেকে অসহায় দুর্বল মনে হয়...মনের যন্ত্রণা আর অস্বস্তি বাড়তেই থাকে।

টলস্টয় স্থির করলেন...এর চেয়ে আরো কড়া ওষুধ চাই। স্বীকারোক্তি আর আত্মধিক্কারে হয়তো ফল পাওয়া যেতে পারে। কারুর কাছে অকপটে স্বীকার করতে হবে তাঁর এই নৈতিক অধঃপতন। রেখে-ঢেকে নয়,—খোলাখুলি প্রকাশ করতে হবে তাঁর এই প্রলোভনের কথা আর আপনার চরিত্র-দুর্বলতার সমস্ত খুঁটিনাটি। ঘৃণায়, লজ্জায় আর আত্মধিক্কারে কারুর সামনে মাথা মাটিতে নত করে দিলে তবেই মুক্তি, তবেই পাপক্ষালন...

তাই ঠিক করলেন, একলা আর না বেড়িয়ে সঙ্গে নেবেন ছেলেদের মাস্টার মশাইকে। বলবেন তাকে সমস্ত কথা...প্রত্যেকটি ঘটনা, তাঁর মনোভাবের আর গোপন আকাঙ্ক্ষার প্রতিটি লজ্জাকর তথ্য প্রকাশ করবেন অকপটে তার কাছে।

তাই করলেন টলস্টয়। ডোমনাকে তাঁর জমিদারি থেকে অন্যত্র সরিয়ে দিলেন। আর এই শিক্ষকটির সাহচর্যে, তার কাছে সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশে এবং নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করে মুক্তি পেলেন টলস্টয়...অমানুষিক দৃঢ়তায় চিত্তশুদ্ধি হল। সমস্ত গ্লানি দূর হল, স্থূল দেহ পরাস্ত হল আত্মিক সাধনার কাছে।

জীবনের এই সঙ্কটকাল অতীত হয়ে যাবার পর, টলস্টয় বড় বেশি উল্লেখ করতেন না এই ঘটনার। যদি কেউ তার যৌন-জীবনের বিপত্তি উল্লেখ করে তাঁর কাছে পরামর্শ চাইতেন, তবেই তিনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতেন...

কেবল একটিবার তিনি এই ঘটনার বিশদ বিবরণ লিখে জানিয়েছিলেন তাঁর এক নিকট-বন্ধুকে। তবে এই ব্যাপার টলস্টয়ের জীবনে এক গভীর রেখাপাত করেছিল, এ-কথা সত্য। The Kreutzer Sonata, Resurrection প্রভৃতি গ্রন্থে এই দেহ-সম্ভোগের প্রলোভন তিনি চিত্রিত করে গেছেন। আর এই বর্তমান ছোট উপন্যাসখানিতে তিনি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতাকে নির্মম লেখনী দিয়ে ফুটিয়েছেন। 'শয়তানে'র নায়ক ইউজিন যে-দুস্তর বিক্ষোভ অতিক্রম করেছে, স্টিপানিডার দেহের প্রতি তার যে-দুর্দমনীয় আকর্ষণ তাকে পাগল করেছে—যে-সমস্ত আত্মচিন্তা, দ্বন্দ্ব আর গ্লানি তাঁকে পীড়িত, নির্যাতিত করেছে প্রতিনিয়ত, তার মধ্যে বহুলাংশই সত্যকারের ঘটনা, প্রকৃত ও বাস্তব অভিজ্ঞতা।

এই বইয়ের মধ্যে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক, যৌন-জীবনের ব্যাখ্যা, প্রলোভন-জয়ের পন্থা আর সংযম ও আত্ম-নিরোধের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তার সঙ্গে বর্তমান কালের অনেকেই—এমনকি টলস্টয়ের সমকালীন চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও একমত হতে পারেন নি। দেহবাদিতা সম্পর্কে টলস্টয়ের মত ও বিশ্বাসের যে পরিচয় পাওয়া যায় বইখানিতে, সে-সম্বন্ধেও আধুনিক পাঠক-সমালোচকদের মনে সন্দেহ হয়েছে, টলস্টয় কতটা আন্তরিক বিশ্বাস করতেন। কেউ কেউ বলেন, যৌন-জীবন সম্পর্কে তাঁর মন ছিল খোলা এবং এ-বিষয়ে তাঁর বিশেষ সঙ্কোচ বা শুচিবাদিতা ছিল না। মৌখিক প্রকাশও ছিল গ্রাম্যতা-ঘেঁষা। ম্যাক্সিম গোর্কির লেখা 'টলস্টয়ের স্মৃতি-চিত্র' পড়লে তাই মনে হয়। পরবর্তী জীবনে তাঁর ধর্ম ও নৈতিক মতামতের অনেক পরিবর্তন ঘটে। তখন সংযম ও চিত্তশুদ্ধির উপর তাঁর আস্থা বাড়ে, যেটি বোঝা যায় 'শয়তান' উপন্যাসের নায়ক ইউজিনের দ্বিধাবিভক্ত মন ও আচরণ থেকে। টলস্টয়ের ব্যক্তিত্বেও এই দ্বৈত ভাব ও তজ্জনিত অসঙ্গতি লক্ষ করা যায়।

বস্তুত, টলস্টয় একদিকে হলেন 'গ্রেট এরিস্টোক্র্যাট', অপরদিকে খাঁটি রুশ 'ম্যুজিক' বা চাষি-শ্রমিক। আর, স্ত্রীলোক সম্পর্কে টলস্টয়ের মধ্যে বেশ একটা বৈরীভাব ছিল। নারীর প্রতি তাঁর এই মনোভাব, গোর্কি লিখেছেন, "The hostility of the male, the hostility of the spirit against the degrading impulses of the flesh."

আত্ম-নিরোধ, অনুশোচনা, দেহ-দমন প্রভৃতি উপায়গুলো হয়তো একদা তাঁর কাছে পরীক্ষিত সত্য। তবে টলস্টয়ের আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে না পারলেও কোনো ক্ষতি নেই। শিল্পী টলস্টয়ের নিষ্ঠা, সংযম এবং দৃঢ় আন্তরিকতা সম্বন্ধে কিন্তু কোনো সংশয়ের অবকাশ থাকতে পারে না। তাই গোর্কি নিজে এক মহৎ শিল্পী হয়ে টলস্টয়ের নানা অসঙ্গতি সত্ত্বেও সেই মহান শিল্পীর মৃত্যু-সংবাদে কী ভাবে ও ভাষায় তাঁর অন্তরশ্রদ্ধা লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তা পাওয়া যাবে 'টলস্টয়ের স্মৃতি-চিত্র' গ্রন্থে 'একটি চিঠি' নামক রচনার ৫৮-৬২ পৃষ্ঠায়।

আত্ম-জীবনীমূলক এই রচনাটিতে টলস্টয়ের যে-দৃঢ়বিশ্বাস, ঋজু কাঠিন্য এবং বলিষ্ঠ অন্তঃশক্তির অনিবার্য প্রকাশ, তার তুলনা মেলে মাত্র-আর একখানি বইতে—মহাত্মা গান্ধীর আত্মচরিত 'সত্য নিয়ে পরীক্ষা', "My Experiments With Truth" নামক গ্রন্থে। ক্ষমাহীন আত্মপ্রকাশে, চিত্তশুদ্ধির আপ্রাণ চেষ্টায়, নির্মম নিষ্ঠায় ও নির্বিরোধ অহিংস-ভাবাশ্রয়ী আত্মিক বল-সাধনায়, গান্ধীজী ও টলস্টয়ের নাম একসঙ্গে এসে যায়।

টলস্টয়ের মৃত্যুর পর অনেক লেখা পাওয়া গিয়েছিল, যেগুলো অপ্রকাশিত এবং যার অধিকাংশ 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' ও অহিংস নীতি-সংক্রান্ত রচনা। পরে কিছু কিছু লেখা অবশ্য প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু 'শয়তান' উপন্যাসখানিই তাদের মধ্যে একমাত্র সম্পূর্ণ ও সার্থক রচনা। এতে আছে শিল্প-সৃষ্টির দৃঢ় পরিচয়। শুধু ব্যক্তিগত ইতিহাসের কারণে নয়, লেখার গুণে এবং সংযত পরিবেশনেও মহৎ-শিল্পী টলস্টয়ের বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব অক্ষুণ্ন আছে এই ছোট উপন্যাসখানিতে। দুটি উপসংহার তিনি লিখে গেছেন। সেই দুটিই মুদ্রিত হল এখানে। কিন্তু তিনি জীবিত থাকলে বইখানি যদি প্রকাশিত হত, তাহলে কোনো পাঠান্তর গ্রহণ করে তিনি গল্পের শেষ করতেন, সেটির অনুমান-দায়িত্ব পাঠকদের ওপর ছেড়ে দিলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইউজিন আর্তেনিভের সামনে ছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। অর্থাৎ জীবনে কৃতিত্ব অর্জন করতে হলে যে-যে উপকরণের প্রয়োজন, তার কিছুরই অভাব ছিল না। বাড়িতে ইউজিনের যে-শিক্ষালাভ হয়েছিল, তার বনিয়াদটা ছিল পাকা। পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের ডিগ্রি নিয়ে সে সসম্মানে পরীক্ষা-উত্তীর্ণ হয়েছিল। সম্প্রতি তার পিতার লোকান্তর হয়েছে বটে কিন্তু তাঁরই খাতিরের সূত্রে বড় সমাজের উচ্চ ও অভিজাত কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে ইউজিনের যথেষ্ট আলাপ ও হৃদ্যতা আছে। তা ছাড়া, কোনো এক উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারীর আনুকূল্যে ইতিমধ্যেই সে এক রাজ-দপ্তরে সরকারি কাজ যোগাড় করে নিয়েছে।

উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া পৈতৃক সম্পত্তিটাও নেহাৎ কম নয়। ভালোই বলতে হবে যদিও আয়ের দিক থেকে এটা খুব নিশ্চিত, লাভবান ছিল না। তার বাবা বেশিরভাগ বাইরে-বাইরে কাটাতেন, অধিকাংশ সময়ে থাকতেন পিটার্সবুর্গে। নিজে ও স্ত্রী দুজনে মিলে বেশ ভালোভাবেই খরচপত্র করে বাস করতেন। আর দুই ছেলেকে বছরে বছরে প্রত্যেককে ছ-হাজার করে রুবল দিতেন তাদের নিজস্ব খরচের জন্য। বড় ছেলে হল এ্যানড্রু, সে ছিল ঘোড়সওয়ার সৈন্যদলে। প্রতি বছরেই গ্রীষ্মকালটায় মাস দুই তিনি এসে থাকতেন নিজের জমিদারিতে। কিন্তু মহাল পরিদর্শন করা, টাকা আদায়, সম্পত্তি দেখাশুনো করা—এ-সমস্ত কোনো কাজেই তিনি মাথা ঘামাতেন না। সমস্ত জমিদারি চালনার ভারটা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন তাঁর নায়েবের ওপরে। কিন্তু এই ভদ্রলোক ছিলেন নামেই ম্যানেজার, কাজ তিনি একটা বড় করতেন না। ধূর্ত ও অসৎ লোক,—কাজে ফাঁকি দিতে ওস্তাদ এবং বেশিরভাগ সময়েই মহালে অনুপস্থিত থাকতেন।

বাপের মৃত্যুর পর ছেলেরা নিজেদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগাভাগি করে নিতে বসল। কিন্তু ভাগ করতে গিয়ে দেখা গেল, বিস্তর দেনার দায়। এত বেশি যে, পারিবারিক উকিল ভদ্রলোক পরামর্শ দিলেন যে, এ-ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার অস্বীকার করে সম্পত্তি ছেড়ে দেওয়াই ভালো। খালি পিতামহীর কাছ থেকে পাওয়া দশ হাজার রুবলের বিষয়টা রাখা যেতে পারে। কিন্তু পার্শ্ববর্তী আর-এক জমিদার এসে অন্যরকম পরামর্শ দিলেন। বৃদ্ধ আর্তেনিভের সঙ্গে এই ভদ্রলোকের টাকা লেনদেন চলত। কয়েকখানা বন্ধকি খত ও হাতচিঠা ছিল তাঁর কাছে। এগুলোর আদায়ের চেষ্টাতেই তিনি পিটার্সবুর্গ থেকে এলেন ছেলেদের সঙ্গে দেখা করতে। এসে বললেন যে, দেনা আছে সত্যি বটে, কিন্তু তারও একটা বিহিত করা যায়। দেনা মিটিয়ে যদি কিছু হাতে নগদ আর বিষয়-আশয় রাখতে চায় ছেলেরা, সে-ব্যবস্থা অনায়াসেই হতে পারে। মস্ত বড় যে-জঙ্গলের মহালটা রয়েছে সেইটে আর কিছু বার-দিকের খুচরো জমি বিক্রি করে ফেললে সুরাহা হবে। কেবল সেমিয়োনভ তালুকটা যেটা সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সম্পত্তি অর্থাৎ চার হাজার বিঘে আন্দাজ পোড়ো মাটির জমি, চিনির কারখানা, আর দুশো বিঘের মস্ত বড় বিল—এইটে রাখলেই যথেষ্ট। যদি এই বিষয়টুকু ভালোমতো তদ্বির-তদারক করা যায়, জমিদারিতে নিজে বসবাস করে বুদ্ধি খাটিয়ে চাষ-আবাদ করা যায়—তা হলে ঐ আবাদেই ফলবে সোনা। অনর্থক খরচ বাঁচিয়ে যে মিতব্যয়ীভাবে জমিজমা চালাতে জানে তার পক্ষে গুছিয়ে নেওয়া কিছু শক্ত নয়।

তাই বাপের মৃত্যুর পর ইউজিন এল জমিদারিতে এবং বসন্তকালটা এখানেই কাটালে। এই সময়টা বাজে নষ্ট না করে সে জমিদারির সমস্ত কাগজপত্র হিসেব-আদায় তন্ন তন্ন করে দেখে ব্যাপারটা বুঝে নিলে। বেশ কিছুদিন মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করার ফলে ইউজিনের দৃঢ় ধারণা হল যে, সমস্ত বিষয়-আশয়ের মধ্যে আসল সম্পত্তিটা বাঁচানোই দরকার। তাই সে ঠিক করলে যে, সরকারি কাজে ইস্তফা দিয়ে মাকে নিয়ে জমিদারিতেই বাস করবে আর নিজে হাতে জমিদারি চালাবে। তখন বড় ভাইয়ের সঙ্গে সে একটা আপস করে ফেললে। বছরে বছরে ইউজিন এ্যানড্রুকে চার হাজার করে রুবল দেবে। নয়তো একসঙ্গে সে আশি হাজার রুবল থোক টাকাটা নিয়ে একটা

www.BanglaBook.org

লেখাপড়া করে দিক ছোট্ট ভাইকে এই শর্তে নিজের অংশটা ছেড়ে দিয়ে।

এই বন্দোবস্তই বহাল হল। পাওনাদার জমিদারের প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে বড় ভাইয়ের সঙ্গে একটা বিলি-ব্যবস্থা করে ইউজিন মাকে নিয়ে এসে প্রকাণ্ড বাড়িটায় বসবাস করতে লাগল। তারপর বিশেষ উৎসাহের সহিত এবং খানিকটা সতর্কভাবে সে জমিদারি-চালনায় মনোনিবেশ করলে। সাধারণ লোকের ধারণা যে, বৃদ্ধ মানুষদেরই গোঁড়ামি আর সংস্কার থাকে এবং তাদের মনোভাবটা হয় বেশি মাত্রায় রক্ষণশীল আর যারা নবীন ও তরুণ তারাই চায় নতুনত্ব, পরিবর্তন। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। দেখা গিয়েছে, অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী লোকেরাই বেশিরভাগ স্থিতিশীল জীবনের পক্ষপাতী—যারা স্বচ্ছন্দ স্ফূর্তিতে জীবন-যাপন করতে চায়, কিন্তু ভেবে দেখে না এবং ভাববার সময়ও নেই, কীভাবে জীবনটা কাটানো উচিত। তাই তারা একটি সুপরিচিত জীবন-আদর্শকে অনুসরণ করে, সেই জীবনযাত্রার ছকমাফিক আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলে গড়েপিটে নেয়, যার সম্বন্ধে তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে।

ইউজিনের বেলায়ও তাই হয়েছিল। গ্রামে এসে বসবাস করে তার ধারণা এবং লক্ষ্য হল পুরানো দিনের জীবন-প্রণালীকে আবার ফিরিয়ে আনা। তার বাবা তেমন সাংসারিক, অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন না ; তাই পিতামহের আমলের চালচলন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে ইউজিন বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল। এখন সমগ্র জমিদারিতে ক্ষেত-খামার, বাগান-বাগিচা, এমনকি বসত-বাড়িতেও —সর্বত্রই সে চেষ্টা করতে লাগল পিতামহের জীবনের ধারাটি ফিরিয়ে আনবার জন্যে। অবশ্য বর্তমানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে কিছুটা অদল-বদল করতেই হল। কিন্তু মোটামুটি সেই বিগত দিনের হালচাল, অতীত জীবনের সুরটাকে ফুটিয়ে তোলাই হল তার প্রধান উদ্যম এবং কর্তব্য। শান্তি, শৃঙ্খলা, সুনিয়ম এবং সর্বসাধারণের সন্তোষ—এই সবগুলোই হল বড় ব্যাপার। কিন্তু এভাবে বন্দোবস্ত করতে হলে চাই অশেষ ধৈর্য ও পরিশ্রম। সর্বপ্রথম কর্তব্য হল নানা পাওনাদার এবং ব্যাঙ্কের দেনাগুলো পরপর মিটিয়ে দেওয়া। সেই উদ্দেশ্যে আগে কতকগুলো জমি বিক্রি করা জরুরি হয়ে পড়ল এবং কতকগুলি পুরানো খত উসুল করিয়ে নেওয়া আর নতুন খতে সময়ের মেয়াদ বাড়িয়ে নেওয়া। তা ছাড়া অর্থেরও প্রয়োজন। চারশো বিঘে ফসলের জমি আর চিনির কারখানা-সমেত ভালো সেমিয়োনভ তালুকখানা বাঁচাতে হলে চাই কাজের সুবন্দোবস্ত—কিছুটা জমি বিলি করে দেওয়া আর কিছুটা খাসে রেখে জন-মজুর লাগিয়ে ফসল বাড়ানো। এ-ছাড়া রয়েছে প্রকাণ্ড বাগানখানা। সেটাকে ভালোমতো পরিষ্কার না করলে, দেখাশুনা না করলে শিগগিরই নষ্ট হয়ে যাবে, অব্যবহারে জঙ্গল হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু এসবের জন্যে চাই অর্থ, চাই প্রচুর পরিশ্রম। অনেক—অনেক কাজ পড়ে রয়েছে সামনে। কিন্তু ইউজিনও পিছ-পা হবার লোক নয়। দেহে তার প্রচুর শক্তি, মনেও কঠিন, দৃঢ় সঙ্কল্প। বয়েস তার ছাব্বিশ হয়েছে। মাথায় মাঝারি, ডাঁটো চেহারা, আঁটসাঁট গড়ন। কুস্তি আর ব্যায়ামে পেশিগুলো পরিপুষ্ট, লোহার মতো শক্ত। চেহারা দেখলেই মনে হয় বলিষ্ঠ ব্যক্তি, রক্ত-কণিকায় জীবনীশক্তির অভাব নেই। মুখ থেকে ঘাড় পর্যন্ত প্রাণশক্তির শোণিত-আভাস। দাঁতগুলো ঝকঝকে পরিষ্কার, চুল আর ঠোঁট মোটা নয় অথচ বেশ নরম আর কুঞ্চিত। তার দেহের একমাত্র ত্রুটি তার দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা। অল্প বয়স থেকেই চশমা ব্যবহার করে চোখের স্বাভাবিক তেজ অনেকটা কমে গিয়েছে। এখন একটা প্যাঁসনে ছাড়া সে চলতেই পারে না। সর্বক্ষণ পরকোলা ব্যবহার করার ফলে নাকের ওপর বরাবরের মতো একটা দাগ বসে গিয়েছে।

এই হল মোটামুটি তার বাইরের চেহারা। আর অন্তরের চেহারা সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায় যে, তার সঙ্গে যতই মেলামেশা করা যায়, ততই মানুষটাকে ভালো লাগে। ভিতরকার মানুষটির এইটিই হল বৈশিষ্ট্য। তার মা বরাবরই তাকে বেশি স্নেহ দিয়ে এসেছেন। আর সবাইকে যত-না ভালোবেসেছেন তার চেয়ে বেশি ভালোবেসেছেন এই ছেলেকে। এখন স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর অন্তরের সমস্ত স্নেহ-প্রীতি এই এক জায়গায় শুধু ঢেলে দেন নি, তাঁর সারা জীবনের অর্থ যেন এখানেই নিবদ্ধ করেছেন। শুধু যে মা-ই তাকে ভালোবেসেছেন, তা নয়। স্কুলের, তারপর কলেজের

www.BanglaBook.org

সমস্ত বন্ধু-সঙ্গীরাও তাকে খুব পছন্দ করত। শুধু পছন্দ নয়, শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম করত। যারই সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয় হয়েছে, তারই ওপর তার একটা প্রভাব বিস্তার হয়েছে। তার মুখের কথাও অবিশ্বাস করা একরকম অসম্ভব বললেই হয়। যার মুখে এমন সরল সততার ছাপ, বিশেষ করে যার চোখে এমন নির্মল অকুণ্ঠ চাহনি, তার স্বভাবে কোনো শঠতা বা প্রতারণার আভাস সন্দেহ করা ধারণার বাইরে।

মোট কথা ইউজিনের চরিত্রে একটি সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্বের ছাপ ছিল যেটি তাকে যাবতীয় সাংসারিক কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। যে উত্তমর্ণ একজনকে টাকা ধার দিতে অস্বীকার করেছে, ইউজিনকে সে বিশ্বাস না করে পারে নি। গ্রামের কোনো বৃদ্ধ অগ্রণী হোক, নকলনবিস হোক অথবা কোনো দরিদ্র কৃষকই হোক, ইউজিনের সঙ্গে কোনো প্রবঞ্চনার কথা কল্পনাও করতে পারত না। অন্য কারুর সঙ্গে কূট চাল বা ধূর্ত মতলব তারা ফাঁদতে পারে, কিন্তু এমন একজন খোলামেলা, চমৎকার সরল-হৃদয় লোকের আন্তরিক সংস্পর্শে এসে সে চিন্তা তারা ভুলে যেতে বাধ্য হয়।

মে মাসের শেষ। শহরে থাকতে ইউজিন চেষ্টাচরিত্র করে খালি জমিগুলো বন্ধকি থেকে ছাড়িয়ে নেবার বন্দোবস্ত করেছিল যাতে সেগুলো কোনো কারবারি লোককে বিক্রি করা যায়। সেই ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের কাছ থেকেই ইউজিন কিছু টাকা কর্জ করলে। কেননা, জোত-জমার কাজে রসদের দরকার। চাষের জন্যে চাই হালের বলদ, গরুর গাড়ি আর ঘোড়া। তা ছাড়া, ক্ষেত-খামারের ফসল মজুত করবার জন্যে চাই গোলাবাড়ি এবং তার জন্যে টাকার প্রয়োজন তো আছেই।

ইউজিন বন্দোবস্ত করে নিল একরকম। বড় বড় কাঠের গুঁড়ি গাড়ি করে চালান আসতে লাগল। ছুতোরেরাও কাজ আরম্ভ করে দিল। আর সত্তর-আশিখানা গাড়িভর্তি জমির জন্যে প্রচুর সার এনে ফেলা হল। কিন্তু তবু এইসব কাজকর্ম শুরু হওয়ার মধ্যেও কেমন যেন একটা অনিশ্চয়তার ভাব রয়েছে, যেনসব কিছুই সুতোর আগায় ঝুলছে।

এইসব কাজ-কর্ম ও চিন্তায় যখন ইউজিন অত্যন্ত জড়িত ও ব্যস্ত, সেই সময় একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি তার মনের মধ্যে জাগতে লাগল। ব্যাপারটা তেমন গুরুতর না হলেও নিতান্ত উড়িয়ে দেওয়াও চলে না। এক-এক সময় রীতিমতোই বিশ্রী লাগে।

বয়েস যখন কাঁচা ছিল, ইউজিনের জীবন আর দশজন সাধারণ যুবকের মতোই চলেছিল। অর্থাৎ স্বাস্থ্যবান যুবকরা সাধারণত যেভাবে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে, ইউজিনও সেইভাবে স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিরে চালিয়ে এসেছে। নানা ধরনের স্ত্রীলোকের সঙ্গে ইতিপূর্বে তার যৌনসম্পর্ক ঘটেছে। ইউজিন উচ্ছৃঙ্খল বা কামুক প্রকৃতির লোক নয়। কিন্তু তাই বলে সাধু-সন্ন্যাসীর মতো জিতেন্দ্রিয় পুরুষও নয়। স্ত্রীলোকের প্রতি তার যে-আকর্ষণ, অর্থাৎ যে-কারণে ইউজিন মেয়েদের প্রতি ঝুঁকেছে, সেটা একান্তই জৈব আকর্ষণ। স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিরে, আর তার নিজের ধারণা—মনটাকে খোলা ও পরিষ্কার রাখতে হলে স্ত্রীলোকের দৈহিক সম্পর্ক অপরিহার্য পুরুষের পক্ষে। বয়েস যখন তার বছর ষোল, তখন থেকে তার যৌন-জীবন শুরু হয় এবং এতদিন চলেছে বেশ সন্তোষজনকভাবেই। বিশেষ কোনো গোলমালে পড়তে হয় নি দৈহিক প্রয়োজনের তাগিদে। কোনো হাঙ্গামা-যে পোহাতে হয় নি ইউজিনকে তার প্রথম কারণ হল ইউজিনের দৃঢ় মন ও সংযম। কোনো দিনই সে ইন্দ্রিয়ভোগের দাস হয় নি। দেহের ও মনের লাগাম বেশ কড়া হাতেই সে ধরতে জানে। তাই একদিনের জন্যেও সে বিব্রত বোধ করে নি। এ-যাবৎ কোনো কুৎসিত রোগ তার দেহকে আশ্রয় করতে পারে নি। ব্যভিচার-প্রবৃত্তিকে শক্ত হাতে দমন করে রাখার ফলে কোনো স্ত্রীলোক তাকে খেলার পুতুল হিসেবে ব্যবহার করতে সাহসও করে নি। অন্ধ মোহে আচ্ছন্ন হবার মতো পুরুষ সে নয়। প্রথম জীবনে পিটার্সবুর্গে একটি মেয়ে ছিল তার রক্ষিতা। সেলাইয়ের ব্যবসা ছিল তার। কিন্তু দেখা গেল তার আদুরে ও নাটুকে ভাবটা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ইউজিনের ধাতে এসব পোষাল না। ঘাড়ে চড়ে বসবার আগেই ইউজিন তাকে সযত্নে ঝেড়ে ফেলে অন্য ব্যবস্থা করে নিল। ব্যক্তিগত জীবনের এই পর্যায়টি মোটামুটি বেশ মসৃণভাবেই গড়িয়ে এসেছে। এ-যাবৎ তা নিয়ে ইউজিনকে বিশেষ কোনো বেগ পেতে হয় নি।

www.BanglaBook.org

কিন্তু আজ প্রায় দু-মাস হতে চলল ইউজিন মফস্বলে এসে বাস করছে। এ-সম্বন্ধে কী যে করা যায় সে-বিষয়ে এখনো কিছু ঠিক করে উঠতে পারে নি। অবস্থান্তরে তাকে আজ অনেক দিন দেহকে উপবাসী, নিরুদ্ধ করে রাখতে হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে বাধ্যতামূলক আত্মদমনের ফলে শরীর ও মনের ওপর টান পড়তে শুরু হয়েছে। তা হলে কী করা যায়? শেষ পর্যন্ত কি তা হলে দেহের ক্ষুন্নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে শহরেই ছুটতে হবে? তাই যদি যেতেই হয়—কোথায় কেমন করে তা সম্ভব হবে? এই সব চিন্তাই গত কয়দিন ধরে ইউজিন ইভানিসকে উত্তপ্ত ও বিব্রত করে তুলেছে। ইউজিনের বিশ্বাস এবং ধারণা যে, শরীরের ধর্মকে বহুদিন দাবিয়ে রাখা চলে না আর তার নিজের ক্ষেত্রে সে প্রয়োজনের তাগিদ অনুভব করছে। তা হলে বর্তমান অবস্থায় সেই প্রয়োজনের খাতিরেই তাকে কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হয়! কিন্তু ইউজিনের এও মনে হল যে, এখন সে তো স্বাধীন নয়, কাজের ও দায়িত্বের চারদিকের বাঁধনে তাকে শক্তভাবেই বেঁধে ফেলেছে। তাই আপনার অজ্ঞাতসারেই আশেপাশের প্রতিটি যুবতী নারীর পিছু-পিছু তার স্বাধীন দৃষ্টি ঘুরতে লাগল।

নিজের গ্রামে বসে কোনো নিন্দনীয় ব্যাপার বা কেলেঙ্কারি করার পক্ষপাতী নয় ইউজিন। এখানকার বিবাহিতা কিংবা কুমারী মেয়ের সঙ্গে অবৈধ সম্বন্ধ স্থাপন করা ইউজিনের মনঃপূত নয়। লোকমুখে সে শুনেছে যে, এ-সমস্ত ব্যাপারে তার বাপ-পিতামহ অন্য প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁদের সমসাময়িক অন্যান্য জমিদার বা অভিজাত বংশীয় লোকদের মতো তাঁরা ছিলেন না। স্থানীয় কোনো স্ত্রীলোক অথবা কৃষকদের মেয়েদের সঙ্গে তাঁরা কোনো প্রকার সংস্রবে আসেন নি। তাই ইউজিনও স্থির করেছিল সেও নিজের গ্রামে বসে এইরকম কোনো ব্যাপারে জড়িত হয়ে পড়বে না।

কিন্তু যত দিন যায় ততই দেহের দাবি বাড়তে থাকে। তখন ইউজিন ভেবে দেখলে যে, কাছাকাছি কোনো শহরে এ-ধরনের ব্যাপার জানাজানি হয়ে পড়লে বিপদের আশঙ্কা বেশি। ভূমি-দাস প্রথা উঠে গিয়েছে, মুখ বুজে সহ্য করবার পাত্রও আজকাল কেউ নয়। তার চেয়ে এখানে গ্রামেই ভালো। ইউজিন অনেক ভেবে স্থির করলে—হ্যাঁ, তাই ঠিক। গ্রামের বাইরে অজানা জায়গায় জড়িয়ে পড়া মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে এটা অবিশ্যি দেখতে হবে, কেউ জেনে না ফেলে। কারণ ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে অসম্ভ্রমের সীমা থাকবে না। ইউজিন এই ভেবে মনকে বোঝালে যে, বর্তমানে তার এ-ধরনের চেষ্টা মোটেই অন্যায় নয়। কেননা, সে তো কামপ্রবৃত্তির দাস হয়ে ইন্দ্রিয়-সুখ চরিতার্থ করতে যাচ্ছে না। যা-কিছু করতে যাচ্ছে, সেটা স্বাস্থ্যেরই খাতিরে, নিছক শরীরধর্ম পালনের জন্যে।

সঙ্কল্প স্থির হবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু ইউজিন যেন আরো বেশি চঞ্চল, আরো অস্থির হয়ে উঠল! যখনই সে গ্রামের বয়োবৃদ্ধ বা মোড়লের সঙ্গে অথবা চাষি-মজুর, ছুতোরদের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বলত, তখনই ঘুরেফিরে সেই একই কথায় এসে পৌঁছুত অর্থাৎ স্ত্রীলোকের প্রসঙ্গ। আর স্ত্রীলোকের কথা একবার উঠলে সে প্রসঙ্গ থামাতে চাইত না। এখন থেকে গ্রামের মেয়েদের ওপর নজরটা তার আরো বেশি করে যেন প্রখর হয়ে উঠল, চাহনিটাও হল তীক্ষ্ণতর।

২

মনে মনে কোনো একটি বিষয়ের নিষ্পত্তি করা এক, আর তাকে কাজে পরিণত করা আর-এক জিনিস। শুধু করলে কী হবে? কাজে অগ্রসর হওয়া চাই। কিন্তু সেখানেই বাধে মুশকিল। কোনো স্ত্রীলোকের কাছে এমনি একটি প্রস্তাব নিয়ে নিজে থেকে এগিয়ে যাওয়া? অসম্ভব। কার কাছে? কোথায়? নাহ্—এ-কাজ আর কোনো লোকের মধ্যস্থতায় সারতে হবে। কিন্তু সেই তৃতীয় ব্যক্তিটি কে—যাকে এসব কথা খুলে বলা যায়?

একদিন বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়ল ইউজিন। তৃষ্ণার্ত হয়ে জলের সন্ধানে জঙ্গল-মহালের এক চৌকিদারের কুটিরে এসে সে পৌঁছাল। চৌকিদার পুরানো পরিচিত লোক—তার বাবার শিকার-সঙ্গী। সাবেক আমলে বহুবার শিকারের খোঁজে সে ইউজিনের বাবার সঙ্গে ঘুরেছে, বন তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। আজ ওর সঙ্গে বসে বসে ইউজিন অনেকক্ষণ গল্প করলে। এই সরল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বনপ্রহরী কত কথাই শোনালে তাকে—শিকারের উত্তেজনা আর স্ফূর্তি-আমোদের কত কাহিনী। বসে বসে, গল্প শুনতে শুনতে ইউজিনের মাথায় হঠাৎ একটা চিন্তা খেলে গেল—আচ্ছা। এই ছোট্ট ছাউনি ঘরে কিংবা বনের মধ্যেই কোনো নিভৃত জায়গায় সে-ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? কিন্তু কীভাবে সে-বন্দোবস্ত করা যায়, তার হদিস পায় না ইউজিন। বুড়ো দানিয়েল কি রাজি হবে ভার নিতে? হয়ত তার এ-প্রস্তাব শুনে আশ্চর্য, হতভম্ব হয়ে যাবে। আর ইউজিন নিজে? কথাটা পেড়ে শেষকালে যদি প্রত্যাখ্যান জোটে কপালে, তাহলে লজ্জার আর পরিসীমা থাকবে না। কিংবা এমনও তো হতে পারে—বুড়ো চট করে সহজেই রাজি হয়ে যাবে।

বুড়ো দানিয়েল অনেকটা আপন মনেই উৎসাহিতভাবে গল্প করে যাচ্ছে, আর ইউজিন খানিকটা অন্যমনস্কভাবে শুনে যাচ্ছে।

দানিয়েল বলছিল, 'একবার সত্যিই শিকারে ক্লান্ত হয়ে আমরা দূরে গিয়ে পড়েছিলুম। বিশ্রামের জন্যে সেই গ্রামের পাদরি-গিন্নির মেঠো ঘরখানায় গিয়ে আশ্রয় নিই। ঐখানেই ফিয়োদর জাখারিচ প্রিয়ানিশনিকভের জন্যে একটি মেয়েমানুষ জোগাড় করে আনি।'

ইউজিন মনে মনে বলে উঠল, 'এবার ঠিক হয়েছে!'

দানিয়েল বুড়ো কী যেন একটু ভেবে বললে, 'আপনার স্বর্গীয় পিতাঠাকুর কিন্তু উঁচুদরের লোক ছিলেন। এসব ছ্যাবলামির ব্যাপারে তিনি কখনো নামতেন না।'

'এর কাছে দেখছি সুবিধে হবে না।' ইউজিন মনে মনে বলল চিন্তিতভাবে। তবু পরখ করবার জন্যে জিজ্ঞাসা করল দানিয়েলকে—'আচ্ছা, এসব কুৎসিত ব্যাপারে তুমি নিজেকে জড়ালে কেমন করে?'

'কেন এর মধ্যে খারাপটা কী হল? মেয়েটি আনন্দের সঙ্গেই রাজি হয়ে গিয়েছিল আর ফিয়োদর জাখারিচ—তিনিও খুবই খুশি এবং তৃপ্ত হয়েছিলেন, মাঝখান থেকে আমি এক রুবল বকশিশ পেলুম। তা ছাড়া, ফিয়োদরের কী দোষ বলুন? চটপটে স্ফূর্তিবাজ লোক—একটু-আধটু টানেও…"

'এইবার কথাটা পাড়া যেতে পারে—' ইউজিন আশ্বস্ত হয়ে ভাবল এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রসঙ্গটা উত্থাপন করল।

'কি জানো দানিয়েল—আমার এক-এক সময়ে মনে হয় অসহ্য—মানে, এভাবে নিজেকে চেপে রাখা…'

ইউজিন বুঝতে পারে, কথাগুলো বলতে বলতেই সে লজ্জায় আর সঙ্কোচে লাল হয়ে উঠছে।

দানিয়েল শুধু একটু হাসে। ইউজিন আবার বলে, 'আমি তো সাধু-সন্ন্যেসি নই। তা ছাড়া, আগের অভ্যেস…'

ইউজিন মনে মনে ভাবে—কেন বোকার মতোন এসব কথা বলছে! কিন্তু দানিয়েলের মুখে মৌন সম্মতির লক্ষণ দেখে আশ্বস্ত বোধ করে।

'আচ্ছা মানুষ তো আপনি।' দানিয়েল বলে ওঠে। 'আমাকে আগে বলতে হয়—তাহলে এতদিনে একটা ব্যবস্থা করে ফেলা যেত। সে যা-ই হোক—কাকে চাই, আমাকে শুধু একটু জানিয়ে দেবেন।'

'ওহ্! তাতে বিশেষ কিছু এসে যায় না। আমার কাছে সবই সমান—অবিশ্যি কানা-কুৎসিত না হলেই হল। আর রোগ-টোগ যেন না থাকে।'

'নিশ্চয়ই। তা তো বটেই। আচ্ছা—দেখি…' দানিয়েল নীরবে একটু চিন্তা করল। তারপর বলল, 'ওহো, ঠিক হয়েছে। এইবার মনে পড়েছে—বেশ খাসা জিনিস…'

ইউজিন ইতিমধ্যে আবার লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠেছে।

'এমন সরেস মেয়ে এ-অঞ্চলে মেলা দুষ্কর'—দানিয়েল ফিসফিস করে বলে। 'জানেন, গেল বছর ওর বিয়ে হয়েছে। আর স্বামীটাও এমন! এখনো পর্যন্ত কোনো ছেলেপুলে হল না। ভেবে দেখুন—ওর দাম কত—অবিশ্যি যে চায়, তার কাছে!'

অপ্রস্তুত হয়ে লজ্জায় ভ্রূকুঞ্চিত করে ইউজিন। বলে, 'না, না—ও সবের দরকার নেই। আমি চাই, মানে—বরং এমন যদি কেউ থাকে—যার শরীরে কোনো রোগের বালাই নেই, আর যেখানে হাঙ্গাম-হুজ্জুৎ পোয়াতে হবে না। মনে কর—এমন কোনো স্ত্রীলোক, যার স্বামী বিদেশে থাকে কিংবা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সৈন্যদলে কাজ করে বা অমনি কিছু! মোট কথা ঐ নিয়ে কোনো হৈ-চৈ আমি পছন্দ করি না।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি। আগেই আমি সেটা ঠাউরেছিলুম। ওই স্টিপানিডাকেই আনব শেষ পর্যন্ত আপনার কাছে। ওর স্বামী থাকে সদরে,—আর্মির লোকের মতোই। বড় একটা বাড়ি আসে না। আর চমৎকার মেয়ে স্টিপানিডা। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, নীরোগ। ভারি ছিমছাম। মনে ধরবে আপনার, এ-আমি বলে দিলুম। দেখবেন আপনি—আপনার তৃপ্তিও হবে। এই তো সেদিন বলছিলুম ওকে—তুমি একটু-আধটু বেরোও না কেন? নিজেকে অত গুটিয়ে রাখলে কি চলে? কিন্তু ও কী বলে জানেন?'

'তাহলে, কখন—কবে?' ইউজিন কথাবার্তা সংক্ষিপ্ত করে আনে।

'কালই—আপনি যদি বলেন, মানে যদি আপনার মর্জি হয়। আমি তো ঐ পথেই যাচ্ছি তামাক কিনতে। যাবার সময় একবার ডাক দেব'খন। এখানে আসব, ধরুন কাল দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে। নয়তো রান্নাঘরের পিছনে ছোট্ট বাগানটায়, যেখানে স্নানের ঘরটা দেখা যাচ্ছে—ওখানেও থাকতে পারি। যা বলেন আপনি। দুপুর বেলায়ই ভালো। কেউ থাকে না তখন এদিকটায়। খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই একটু গড়ায়, ঘুমিয়ে পড়ে। সেই সময়টা বেশ নিরিবিলি...'

'আচ্ছা, ঐ কথাই রইল।'

ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি ফিরল ইউজিন। মন তার অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, প্রবল একটা উত্তেজনায় অস্থির ও চঞ্চল। সে ভাবতে লাগল : 'আচ্ছা, এর পর কী দাঁড়াবে? চাষার ঘরের মেয়ে কেমনতর হবে, কে জানে? ধরো, দেখতে সে যদি অত্যন্ত বিশ্রী হয়,—কুৎসিত, স্পর্শের অযোগ্য! তা হলে? না না, তা হতেই পারে না। দেখতে-শুনতে তো ভালোই, দানিয়েল বলল।'

রাস্তায় আসতে আসতে আশেপাশের কয়েকটি দরিদ্র কৃষক ঘরের মেয়েকে বিশেষভাবেই লক্ষ করে ইউজিন আশ্বস্ত করে আপনার উত্তেজিত মনকে। তবু আবার মন সন্দেহ-দ্বিধায় দুলে ওঠে। ভাবে, 'কিন্তু তাকে বলব কী করে? করবই বা কী?'

সারাটা দিন এইরকম অস্থিরভাবে কাটল ইউজিনের। কিছুতেই যেন আত্মস্থ হতে পারছে না। পরের দিন দুপুরবেলায় সে গেল সেই জঙ্গলের ছোট্ট কুঁড়েঘরে। দানিয়েল দাঁড়িয়েছিল প্রতীক্ষায়, দরজার ঠিক সামনেই। চোখাচোখি হতেই নীরব অর্থপূর্ণ চাউনিতে সে মাথা নেড়ে বনের দিকে ইঙ্গিত করল।

একটা গরম রক্তের স্রোত যেন হঠাৎ গিয়ে ধাক্কা দিল ইউজিনের হৃৎপিণ্ডে। এই আকস্মিক আলোড়নটা বেশ সচেতনভাবেই সামলে নিল ইউজিন। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল রান্নাঘরের পেছনে ছোট বাগানটার দিকে।

নির্জন বাগান, কেউ কোথাও নেই।

সেখান থেকে গেল স্নানের ঘরের দিকে। সেখানেও কারুর পাত্তা নেই। কাউকে দেখতে না পেয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল ইউজিন। আশেপাশে উঁকি মেরে দেখল, কেউ আছে কি না। ঘর খালি। আবার বেরিয়ে এল, এদিক-ওদিক চেয়ে দেখল সে। তারপর হঠাৎ কানে ভেসে এল একটা শব্দ—মট করে ছোট গাছের ডালভাঙার শব্দ। শব্দটা লক্ষ করে চারদিকে দৃষ্টি ঘোরাতেই নজরে পড়ল—দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরেই—ঝোপের মধ্যিখানে, ছোট খাদটার ওপারে।

খাদটা পার হয়ে যেন ছুটেই চলল ইউজিন। জায়গাটা কাঁটাগাছে ভর্তি।

ইউজিন লক্ষ করে নি। জোরে যেতে যেতে কাঁটাগুলো গায়ে ফুটতে লাগল ইউজিনের। মাঝপথে নাক থেকে খসে পড়ল প্যাঁসনে চশমাটা। তবু ঢালু জায়গাটার গা বেয়ে অনিশ্চিত পদে ছুটেই চলল একরকম, যতক্ষণ না ঐ উঁচু ঝোপটার কাছে পৌঁছানো যায়।

পরনে মেটে-লাল রঙের স্কার্ট। তার ওপর ধবধবে সাদা, চিকনের কাজ-করা একটি এপ্রন বাঁধা, কোমরের সঙ্গে। মাথায় টকটকে লাল একখানা রেশমি রুমাল। দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি, খালি পায়ে। তাজা সরস বৃন্ত যেন। আঁটসাঁট গড়ন আর সুঠাম দেহশ্রী নিয়ে একটি সতেজ ফুটন্ত। দেহবল্লরী মুখে লাজনম্র স্মিত হাসির রেখা।

www.BanglaBook.org

প্রথমে সে-ই কথা বললে : 'ওধার দিয়ে তো একটা পথ আছে—ঘুরে এসেছেন এইখানে। ঐ পথ দিয়ে এলেই পারতেন।'

তারপর একটু থেমে আবার বললে, 'আমি কিন্তু আগেই এসেছি। অনেকক্ষণ হল দাঁড়িয়ে আছি।'

ইউজিনের মুখে কোনো কথা বেরুল না। স্থির ও ধীর পায়ে একটু একটু করে এগিয়ে গেল শুধু। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যেন পরখ করে নিল একবার। তারপর গায়ের ওপর রাখল নিজের হাত।

প্রায় মিনিট পনের-কুড়ি পরে হল ছাড়াছাড়ি।

এদিক-ওদিক নজর করে খুঁজতেই পাওয়া গেল পড়ে-যাওয়া প্যাঁসনে চশমা-জোড়াটা। কুড়িয়ে নিয়ে ইউজিন চলল দানিয়েলের সন্ধানে।

দেখা হওয়া মাত্রই দানিয়েল প্রশ্ন করলে : 'হুজুরের আশ মিটেছে তো?'

জবাব এড়িয়ে ইউজিন তার হাতের মধ্যে গুঁজে দিল একটা রুবল।

তারপর ফিরতি মুখে বাড়ি।

হ্যাঁ, যথেষ্ট তৃপ্ত হয়েছে ইউজিন। কেবল, প্রথমটায় গভীর একটা লজ্জাবোধ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তারপর সে আড়ষ্ট ভাবটা কেটে গেল। এখন আর কোনো গ্লানি বোধ হচ্ছে না।

ব্যাপারটা বেশ সহজেই নিষ্পন্ন হয়ে গেল। কোনো হাঙ্গামা পোয়াতে হয় নি তাকে। আর সবচেয়ে যেটা নিশ্চিত আরামের কথা, তা হল এই যে, বর্তমানে ইউজিন বেশ সুস্থ বোধ করছে। শরীরে এসেছে স্বাচ্ছন্দ্য, যেন অনেক দিন পরে সে খুঁজে পেল স্বাভাবিক প্রশান্তির দৃঢ়তা।

আর মেয়েটি? তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই ভাবে নি ইউজিন। ভালো করে তার অবয়বগুলো খুঁটিয়ে দেখবার মতোন অবকাশ ও মনের অবস্থা ছিল না ইউজিনের। কেবল এইটুকু জেনে আর নিজে দেখে সে নিশ্চিত এবং তৃপ্ত যে, মেয়েটির শরীর নীরোগ, সতেজ আর পরিচ্ছন্ন। দেখতে কিছু খারাপ নয়—যাতে মনের ইচ্ছাশক্তি গুটিয়ে যায়। বেশ সরল প্রকৃতির মানুষ, অন্তত কোনোও ছলাকলার ধার ধারে না।

'কার বউ কে জানে!' আপন মনেই শুধায় ইউজিন। 'ও হো! পেশনিকভের বউ, দানিয়েল তো তা-ই বলেছিল। কিন্তু কোন্ পেশনিকভ? ও নামে তো দু-ঘর আছে এই গাঁয়ে। হয়ত, বুড়ো মাইকেলেরই ছেলের বউ হবে। হ্যাঁ, তাই তো! বুড়োর ছেলে তো মস্কো শহরেই থাকে। কোনো এক সময়ে দানিয়েলের কাছে পুরো খবর সব নিতে হবে।'

৩

মফস্বলে পল্লিজীবনের যেটা এতদিন ধরে ছিল সবচেয়ে বড় অন্তরায় এবং অসুবিধা,—অর্থাৎ বাধ্য হয়ে জোর-করা আত্মসংযমের অভ্যাস, সেটার প্রয়োজন আর রইল না। ইউজিনের চিত্তে এখন আর কোনো উদ্বেগ নেই। মনের স্থৈর্য এবং স্বাধীন চিন্তায় এখন আর কোনো ব্যাঘাতই ঘটছে না। সহজ এবং সুস্থভাবে এখন আবার নিজের সমস্ত কাজকর্মে মন দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই, যে-বৈষয়িক ব্যাপারে ইউজিন স্বেচ্ছায় নিজেকে জড়িত করেছে এবং তার আনুষঙ্গিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, সেটা মোটেই সহজ নয়। রীতিমতো কঠিন কাজ। কখনো মনে হত ইউজিনের যে, শেষ পর্যন্ত এ-কাজ তার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। হয়ত অবশেষে তাকে তালুকটি বিক্রি করে ফেলতে হবে। তাহলে তো তার এতদিনের অক্লান্ত চেষ্টা পণ্ডশ্রম হয়ে দাঁড়াবে। তখন দাঁড়াবে এই যে, সে কৃতকার্য হতে পারল না,—যে গুরুভার ভবিষ্যতের আশায় একদিন আপন হাতে সে তুলে নিয়েছিল, তাতে সমাপ্তির ছেদ টানবার মতো তার সামর্থ্য আর নেই। ভবিষ্যতের এই চিন্তাই তাকে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন করে তুলল। একটা গোলমালের জের মিটতে না মিটতেই, আর একটা গোলমালের সূত্রপাত হয়। শুরু হয় নতুন করে দুশ্চিন্তা, অভাবিতের আকস্মিক আবির্ভাবে।

জমিজমা-সংক্রান্ত ব্যাপারে লিপ্ত হওয়ার পর থেকে একটা-না-একটা দুর্ঘটনা লেগেই আছে। পিতার দেনার দায় একটির পর একটি হুড়মুড় করে এসে তার ঘাড়ে পড়তে লাগল,—যে-সমস্ত

www.BanglaBook.org

ঋণের কথা সে তো জানতই না, কল্পনাও করে নি। সে স্পষ্টই বুঝতে পারলে যে, তার বাবা ডাইনে-বাঁয়ে, সব জায়গাতেই ধার করেছিলেন। যে মাসে তখন দেনা-পাওনা সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিল, ইউজিন ভেবেছিল এবং আশাও করেছিল যে, জমিদারির খুঁটিনাটি তার নখদর্পণে এসে গেছে। কিন্তু হঠাৎ, গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে, একখানা চিঠি তার হস্তগত হল। তাই থেকে বোঝা গেল যে, ইসিপোভা নামে এক বিধবার কাছে তার বাবার বারো হাজার রুবল পরিমাণের এক দেনা এখনো বাকি রয়ে গেছে, মেটানো হয় নি। অবিশ্যি এ-দেনার প্রমাণ হিসেবে কোনো হাতচিঠা ছিল না। ছিল একখানা সাধারণ রসিদ মাত্র,—যেটা ইউজিনের উকিল মহাশয় বললেন অনায়াসেই অস্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ-অভাবে রসিদখানাকে-যে অগ্রাহ্য করে উড়িয়ে দেওয়া যায়, মাত্র এই কারণেই পিতৃকৃত ঋণকে অস্বীকার করবার মতো বুদ্ধি বা প্রবৃত্তি ইউজিনের মাথায় এল না। কেবল একটা জিনিস সে নিশ্চিত করে জানতে চায় যে, এ-দেনা তার বাবা সত্যই করে গেছেন কি না।

একদিন যথানিয়মে খাবার টেবিলে বসতে গিয়ে সে তার মাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা মা, এই কালেরিয়া ইসিপোভা নামে স্ত্রীলোকটি কে?'

'কে? ইসিপোভা? তোমার ঠাকুর্দা তাকে মানুষ করেছিলেন। কিন্তু কেন বল তো?'

ইউজিন চিঠির সব কথাই খুলে বলল মাকে।

'কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে, এই টাকা আবার চাইতে তার একটুও লজ্জাবোধ হল না! তোমার বাবা তো তার জন্যে অনেক কিছু করে গেছেন!'

'কিন্তু আমি জানতে চাই, মা, যে, এ-টাকা কি সত্যই আমরা তাঁর কাছে ধারি?'

'তা—সে এখন সঠিক কী করে বলি বলো? তবে একে ঋণ বলা যায় না। তোমার বাবার ছিল দয়ার শরীর···।'

'বুঝলুম। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বাবা কি এটা ধার মনে করেছিলেন?'

'তা আমি বলতে পারি না,—মানে, জানি না। খালি এইটুকু জানি আর বুঝতে পারছি যে, ও-দেনাটা বাদ দিলেও এমনি তোমার পক্ষে চালানো খুবই কষ্টকর ব্যাপার...'

ইউজিন বেশ বুঝতে পারল যে, মেরি পাভলোভনা কী যে বলবেন, তা বুঝে উঠতে পারছেন না। তাই ছেলের মনোভাব আঁচ করে কথা বলছেন মাত্র।

ছেলে জবাব দিল, 'তুমি যেটুকু বললে, মা, তাই থেকে অন্তত বোঝা যায় যে, টাকাটা শোধ করতেই হবে। কালই যাব তার ওখানে। কথা বলে দেখব একবার, দেনাটাকে আরও কিছুদিন স্থগিত রাখা যায় কি না।'

'তোমার অদৃষ্ট। তবে তুমি যা বলছ ও করতে চাইছ, আমার মনে হয় সেইটাই সবচেয়ে ভালো। আর তাকে জানিয়ে দিয়ো যে, সবুর তাকে করতেই হবে।'

মেরি পাভলোভনা এইটুকু বলে ক্ষান্ত হলেন। মনে তাঁর অসীম শান্তি। ছেলে-যে বিবেক-বুদ্ধিতে এই সিদ্ধান্ত করেছে, তাতে তাঁর যথেষ্ট গর্ব বোধ হল।

ইউজিনের বর্তমান সাংসারিক অবস্থা সত্যিই তাকে উভয় সঙ্কটে ফেলেছে। আরও মুশকিল হয়েছে এই যে, মা রয়েছেন তার সঙ্গে। তিনি ঠিক অনুমান করতে পারছেন না ছেলের দুরবস্থা। সারাটা জীবন তিনি কাটিয়েছেন একভাবে। আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য আর বিলাসের আবহাওয়ায় অভ্যস্ত জীবন গড়ে তুলেছে তাঁর স্বতন্ত্র মন আর দৃষ্টি। তাই তিনি ধরতেই পারেন না ছেলে কী গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর মাথাতেই ঢোকে না কোনো বিপদ, অথবা বিপর্যয়ের পূর্বাভাস। যদি এমন কোনোদিন আসে, আজই হোক আর কালই হোক, যখন অবস্থার ফেরে সংসারে আশ্রয় বলতে আর কিছুই থাকবে না, মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকুও মিলবে না, তখন ভিটেমাটি সবকিছু বিক্রি করে ছেলেকে চলে যেতে হবে। আর ইউজিনের নিজের রোজগার অথবা মাইনে—তা বড় জোর বছরে হাজার দুই রুবল—এরি উপরে নির্ভর করে ছেলের আশ্রয়ে তাঁকে বাকি জীবন কাটাতে হবে,—এই সব কথা তাঁকে মোটেই চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন করে না। এই নিশ্চিত সঙ্কট থেকে

www.BanglaBook.org

উদ্ধার পেতে হলে একমাত্র উপায় হল কঠিন শৃঙ্খলা—সবকিছু খরচ কমানো এবং বাঁচিয়ে চলা। এই সহজ বাস্তব সত্য কথাটি তিনি বুঝেও বোঝেন না। তাই তিনি ধারণা করতে পারেন না ইউজিন কেন আজকাল এত হুঁশিয়ার হয়ে উঠেছে,—কেন সে সমস্ত ব্যাপারে, মালী-চাকর-সহিসদের মাইনে, এমনকি খাই-খরচ প্রভৃতি সামান্য খুঁটিনাটি বিষয়েও এতটা সতর্ক হয়ে চলছে। তা ছাড়া আর পাঁচজন বিধবার মতোন স্বর্গত স্বামী সম্বন্ধে তাঁর অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস। যদিও পতির জীবদ্দশায় স্ত্রীর এতখানি নিষ্ঠা দেখা যায় নি, তবু বৈধব্যে সে মনোভাব এখন সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়েছে। তাই স্বামী যা করে গেছেন, যে বিধি-ব্যবস্থা চালু করে গেছেন, তা যে ভুল বা অন্যায় হওয়া স্বাভাবিক কিংবা তার কোনো রদবদল হতে পারে, এ-কথা তিনি মনেও স্থান দিতে পারেন না।

অনেক ভেবে ও কষ্ট করে সংসার চালায় ইউজিন। মাত্র দু-জন কোচম্যান ও সহিস দিয়ে আস্তাবল পরিষ্কার আর দু-জন মালীর সাহায্যে বাগান-বাড়ি আর সংলগ্ন জমি ও বাগিচাগুলো পরিচ্ছন্ন রাখা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার।

মেরি পাভলোভনা কিন্তু সরল মনেই বিশ্বাস করেন যে, তিনি আদর্শ জননী। ছেলের মুখ চেয়ে তিনি অনেকখানি আত্মত্যাগ করেছেন। বুড়ো পাচক যা রেঁধে দেয় তাই তিনি অম্লান বদনে মুখে তুলছেন। বাগানটা ভালোমতো পরিষ্কার হয় না, সরু পথগুলো আগাছায় ভরে গেছে। বাড়িতে একটাও খানসামা নেই, মাত্র একজন বালক-ভৃত্য। এতে সম্ভ্রম রক্ষা করা দায়। তবু, এত অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি তো কোনো নালিশ জানান না। নানা অসুবিধার মধ্যে বাস করেও ছেলেকে কোনো অভিযোগ না করে তিনি তো মায়ের যথাকর্তব্যই পালন করছেন।

তাই এই নতুন দেনার খবর যখন পাওয়া গেল, ইউজিন দেখল সর্বনাশ। তার সবকিছু আশা-ভরসা, পরিকল্পনা বাতিল হবার জোগাড় ও দেনা মিটিয়ে আবার সমস্ত গুছিয়ে নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবার মতোন সামর্থ্য এবং অবকাশ আর মিলবে কি না সন্দেহ। মেরি পাভলোভনা কিন্তু অত-শত বুঝলেন না। তিনি এটাকে নিলেন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা হিসেবে, যে ঘটনার মধ্য দিয়েই ইউজিনের সচ্চরিত্র, তার আন্তরিক মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া গেল। তার বেশি কিছু নয়। তা ছাড়া, ছেলের সাংসারিক অবস্থা সম্বন্ধে মায়ের মনে কোনো দুশ্চিন্তার বালাই ছিল না। তিনি ভাবতেন আর মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, ইউজিনের বিয়ে হবে একটা মস্ত সার্থক ব্যাপার। সে বিয়েতে ঘরে আসবে অনেক ধন-দৌলত, আসবে প্রতিষ্ঠা। তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। এমন দশ-বারো ঘর ভদ্র পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে, যারা এই বংশে মেয়ের বিয়ে দেওয়া সৌভাগ্য বলেই মনে করবে। তাই আর দেরি না করে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ইউজিনের বিয়েটা চুকিয়ে ফেলাই ভালো।

মেরি পাভলোভনা ভাবতে থাকেন।

৪

ইউজিন নিজেও ভাবে। তবে মা যেমন করে ভাবেন আর দেখেন বিয়ে-ব্যাপারটা, তেমন করে কখনোই নয়। বিবাহ জিনিসটাকে সাংসারিক সুবিধা ও সচ্ছলতার কৌশল বা উপায় হিসেবে গ্রহণ করতে বাধে তার রুচি ও বিবেকে। বিয়ের সাহায্যে নিজের ভবিষ্যৎ গুছিয়ে নেওয়া অথবা বর্তমানে কোনো উন্নতির ব্যবস্থা করে নেওয়া, এ-কথা ভাবতেও তার মন ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে যায়। ইউজিনের মনোগত অভিপ্রায় এবং কামনা হল কাউকে ভালোবেসে সম্মানজনক প্রস্তাবে তাকে বিয়ে করা। যে-সব মেয়ের সঙ্গে তার পূর্বেই আলাপ ছিল কিংবা যাদের সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়েছে, সম্প্রতি মনে মনে নিজেকে তাদের সঙ্গে তুলনা করত, বিচার করত আপন মনেই পরস্পরের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নিয়ে। এ-দিকে কিন্তু স্টেপানিডার সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্কটা তখনো চলেছে, এমনকি একটা পাকাপাকি বন্দোবস্তে এসে দাঁড়িয়েছে। এতখানি যে দাঁড়াবে, সে-কথা পূর্বে ইউজিন ভাবে নি, অনুমানও করতে পারে নি। কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এখন তাই।

ব্যভিচারের প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক ইউজিনের কখনোই ছিল না। তার ওপর চরিত্রে ও প্রকৃতিতে

www.BanglaBook.org

সে কামুক স্বভাবের মানুষ নয়। যে জিনিসটা সে খারাপ বলে ভাবত বা জানত, সে কাজটা গোপনে লুকিয়ে-চুরিয়ে করা তার ধাতে নেই। তাই প্রথম প্রথম স্টিপানিডার সঙ্গে গোপন মিলনের ব্যবস্থা সে নিজে থেকে কোনো দিনই করতে পারে নি। প্রথম দিন স্টিপানিডার সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর ইউজিন ভেবেছিল, এই শেষ! কিন্তু দেখা গেল, তা হয় না। কিছুদিন যেতে না যেতেই ইউজিন লক্ষ করলে যে, সেই একই কারণে একই ধরনের একটা দৈহিক অস্বস্তি আর মানসিক অতৃপ্তি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে, তাকে পীড়িত করে তুলেছে।

ইউজিন এবার স্পষ্টই বুঝতে পারল আকর্ষণটা কোথায় এবং কী ধরনের। যে-অস্বস্তিকর চাপা গুমোটে মন আর শরীর উদ্ব্যস্ত হচ্ছে, সেটার উৎপত্তি হল একজন বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ আবেদন। সে আকর্ষণ নৈর্ব্যক্তিক নয়, দেহ-নিরপেক্ষও নয়। সে আকর্ষণ ইঙ্গিত-বাহন। সঙ্গে টেনে আনছে সেই উজ্জ্বল কালো চোখের চঞ্চল তারা দুটি, সেই ভরাট গলার ঈষৎ কম্পমান আওয়াজ—'কতক্ষণ হল দাঁড়িয়ে আছি!' মনে পড়ে যাচ্ছে বারে-বারেই সেই তাজা, আঁটসাঁট জীবন্ত তনুদেহের পরিচিত সৌরভ। চোখের সামনে যেন ভাসতে থাকে কোমরে আঁট-করে বাঁধা সেই ছোট গাউনের বুকের কাছটায় একটু উঁচু হয়ে ওঠা সুডৌল স্তনাগ্র-চূড়ার নিটোল আভাস। আর চারিদিকে ঝকঝকে হলুদ তবক-মোড়া সোনালি রোদের থরথর ঝাঁঝের ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে সেই ছায়াচ্ছন্ন নিভৃত হেজেল ও মেপল গাছের ঝোপ।

তাই নিতান্ত লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে এলেও মন তার আবার ছুটল। ইউজিন আবার এগিয়ে গেল বুড়ো দানিয়েলের সন্ধানে।

আবার সেই দুপুরবেলাতেই ধার্য হল পরস্পরের গোপন অভিসার, সেই ছোট্ট ঘন বনের মাঝখানে পুরানো সঙ্কেতস্থলে।

এইবার ইউজিন আরো ভালো করে মেয়েটিকে নজর করবার অবকাশ পেল। সুযোগ ও সুবিধামতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল তাকে। মোটের ওপর ভালোই লাগল তার সবকিছু। মেয়েটির আকর্ষণ এবং মাদকতা অস্বীকার করা চলে না।

তারপর ইউজিন তার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করল, জিজ্ঞাসা করল তার স্বামীর কথা। দেখা গেল ইউজিন যা ভেবেছিল, তাই-ই ঠিক। তার স্বামী বুড়ো মাইকেলেরই ছেলে বটে। মস্কো শহরে অনেকদিন যাবৎ আছে। সেখানে কোচম্যানের কাজ করে।

'আচ্ছা—এটা তুমি কেমন করে... ?' ইউজিন প্রশ্ন করে ফেলে ইতস্তত করে। মানে সে জিজ্ঞাসা করতে চায়, সত্যি কথা জানতে চায়, কেমন করে স্টিপানিডা তার স্বামীর প্রতি এমন অবিশ্বাসী হতে পারল।

'কী কেমন করে?' পালটা জবাবে প্রশ্ন করে বসে স্টিপানিডা।

মেয়েটি খাসা সপ্রতিভ। রীতিমতো চালাক এবং চটপটে। মনে মনে তারিফ করে ইউজিন। আবার শুধোয় : 'আচ্ছা, ঠিক করে বল তো—তুমি কেন আমার কাছে এলে,—মানে আসো?'

'বাহ্, আসব না!' লঘু কৌতুকের শুভ্র হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে স্টিপানিডা। বলে, 'ও-ও কি সেখানে মজা করে না, স্ফূর্তি করে না? আর আমার বেলায় যত দোষ?'

স্টিপানিডার উত্তেজিত কথা বলবার ভঙ্গিটুকু খুব মনোযোগ সহকারে লক্ষ করছিল ইউজিন। ভারি মিষ্টি ও সুন্দর লাগল তার সরল অথচ কপট অভিমান-মিশ্রিত জবাব, তার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, আর ঈষৎ উদ্ধত গ্রীবার কমনীয় ছাঁচটুকু।

সে যাই হোক, ইউজিন নিজে থেকে এবারে এগিয়ে এল না। নিজে থেকে চাইল না এবং স্থিরও করল না এর পরে দু-জনে আবার কোন্ দিনে এসে ঐ জায়গায় মিলিত হবে। এমনকি, স্টিপানিডা যখন আপনা হতেই প্রস্তাব করল যে, এর পর থেকে দু-জনের এমনি দেখা-সাক্ষাৎ চলুক, বুড়ো দানিয়েলের সাহায্যের আর দরকার নেই, ওকে তার মোটেই ভালো লাগে না, ওর মধ্যস্থতার প্রয়োজনটা কিসের—তখনো ইউজিন রাজি হল না।

আসল কথা এই—ইউজিনের মনের অন্তস্তলে ইতিমধ্যে একটা সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। মনে মনে

www.BanglaBook.org

সে আশা করছিল, এইটেই যেন শেষ মিলন হয়। পরস্পরের আর দেখা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। স্টিপানিডাকে তার পছন্দই, মোটেই খারাপ লাগছে না। বরঞ্চ রীতিমতো আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে ইউজিন। তবু তাদের দু-জনের এই গোপন সম্পর্ক অবৈধ, নিশ্চয়ই। কিন্তু অনিবার্য কারণে যখন সেটা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে, তার মধ্যে এমন কিছু দূষণীয় ব্যাপার বোধ হয় নেই।

তবু—তবু মনের কোণে, জাগ্রত সত্তার গভীরে ঘনিয়ে উঠেছে একটা অপ্রসাদ, একটা অহেতুক অস্বস্তির মলিন ছায়া। যেখানে ইউজিন একলা, আপন চৈতন্যের সামনে মুখোমুখি, সেখানে সে কঠিন বিচারক। বিবেকের নিরপেক্ষ বিচারে তাই তার আত্মসমর্থন টিকছে না। মনে হচ্ছে, না এ ঠিক নয়। এই দেখাই যেন শেষ দেখা হয়। আর যদি তা না হয়, প্রার্থনা তার কোনো কারণে যদি সফল না হয়, তাহলে এমন ব্যবস্থায় বা গোপন বন্দোবস্তে সে কোনোমতেই অংশগ্রহণ করতে পারবে না—যাতে করে আবার তাদের ঘনিষ্ঠতা কায়েম হয়ে উঠে।

এইভাবেই কাটল সারা গ্রীষ্মকালটা। এই সময়টার মধ্যে উভয়ে একত্র হল প্রায় দশ-বারো বার। আর প্রত্যেকবারেই দানিয়েলের মধ্যবর্তিতায়।

একবার হল কি—স্টিপানিডার স্বামী এল ঘরে, মস্কো থেকে ফিরে। তাই সেবার আসতে পারল না স্টিপানিডা ইউজিনের কাছে। বুড়ো দানিয়েল প্রতিবারই হুজুরে হাজির। এবারে অসুবিধা দেখে ইউজিনের কাছে সে প্রস্তাব তুলল,—আরেকজন স্ত্রীলোক নিয়ে এলে কেমন হয়! ঘৃণায় সঙ্কুচিত হল ইউজিন, সজোরে প্রত্যাখ্যান করল তার গর্হিত প্রস্তাব।

তারপর স্বামী একদিন চলে গেল, ফিরল তার প্রবাসের কর্মস্থলে। শুরু হল আবার তাদের দেখা-শোনা। আগেকার মতোই যথারীতি, নিয়মিতভাবে তারা এসে মিলত সেই পরিচিত স্থানটিতে। যে-সম্পর্কে সাময়িক ছেদ পড়েছিল, আবার তা প্রতিষ্ঠিত হল। প্রথম প্রথম দানিয়েলকে ডাকা হত, আগেকার বন্দোবস্ত অনুসারে। কিন্তু কিছুদিন পরে তার আর প্রয়োজন রইল না। দানিয়েলকে ছেড়ে দেওয়া হল। ইউজিন কেবল তারিখটার উল্লেখ করে বলে দিত, 'অমুক দিন এসো।' যথাসময়ে হাজির হত স্টিপানিডা, সঙ্গে আরেকজন স্ত্রীলোক নিয়ে। কেন না, কৃষকের ঘরের মেয়ে বা বধূ একলা ঘুরে বেড়ানো সমাজ-রীতির বিরুদ্ধে। সঙ্গিনীটির নাম প্রোখোরোভা।

একদিন ভারি মুশকিল হল। সেদিন যে-সময়ে স্টিপানিডার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার কথা ছিল ইউজিনের, ঠিক সেইদিনই সেই সময়ে, বাড়িতে এলেন অতিথির দল সপরিবারে। মেরি পাভলোভনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন এঁরা, সামাজিক শিষ্টাচার হিসেবে। সঙ্গে ছিল সেই পরিবারেরই একটি মেয়ে, বহুদিন ধরে যার ওপরে নজর রেখেছিল ইউজিনের মা। মনে মনে এঁটে রেখেছিলেন ইউজিনের সঙ্গে সেই মেয়েটির বিয়ে হলে বেশ হয়। তাই ইউজিনকে ভদ্রতা রক্ষার খাতিরে বাড়িতে আটকে থাকতেই হল। বাড়িতে অতিথি বসিয়ে রেখে অভিসারে বেরুনো অসম্ভব। তবে ফুরসৎ পাওয়া মাত্রই ইউজিন চট করে বেরিয়ে পড়ল। গোলাবাড়ির পিছনে ফসল ঝাড়াই হচ্ছে, তাই দেখবার নাম করে ইউজিন ঐ পথ দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল বনের দিকে। পুরানো সঙ্কেতস্থলে অধীর আগ্রহে এসে যখন সে পৌছুল, দেখল জনশূন্য ঝোপ—কেউ কোথাও নেই। তবে যে-জায়গাটিতে প্রতিবার স্টিপানিডা প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকত সেই জায়গাটির আশেপাশে হাতের নাগালের মধ্যে যত কিছু ছোটখাটো গাছের চারা আর ডালপালা ছিল, সব ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে আছে। হেজেল গাছের ছোট্ট ডালগুলো দুমড়ানো,—একটা সরু লাঠির মতোন মেপল গাছের নতুন সবুজ চারাটিকেও মচকে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

চোখের সামনে সব দেখতে পেল ইউজিন। বহুক্ষণ ধরে আগ্রহ প্রত্যাশায় অপেক্ষা করেছে স্টিপানিডা। তারপর নিরাশ হয়ে ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। নিষ্ফল অভিসারের ব্যর্থ আক্রোশে ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে শেষ পর্যন্ত চলে গিয়েছে, রেখে গিয়েছে বিরক্তি আর অভিমানের কয়েকটি অকাট্য প্রমাণ? ধূলিসাৎ প্রত্যাশার ধূলিসাৎ নিদর্শন।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল ইউজিন। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে চলল দানিয়েলের সন্ধানে। বৃদ্ধ বন-প্রহরীকে বলে দিল যেন কাল আবার স্টিপানিডাকে আসবার জন্য খবর দেওয়া হয়।

www.BanglaBook.org

এল স্টিপানিডা—যথারীতি, ঠিক সময়েই। যেন কিছুই হয় নি। সহজ এবং স্বাভাবিক।

কাটল সারা গ্রীষ্মকাল এইভাবে। প্রতিবারই উভয়ে এসে মিলত বনের মধ্যে, সেই নির্দিষ্ট স্থানটিতে। কেবল একবার, শরৎকালের কাছাকাছি তারা পিছনকার উঠোনে ছোট্ট ছাউনি-ঘরটায় এসে উঠেছিল। তারপর কিছুক্ষণ পরেই চলে যেত যে-যার নিজের ঘরে। গতানুগতিক, নিয়মিত, পূর্ব-নির্ধারিত তাদের অভিসার।

ব্যক্তিগত জীবনে, এই গোপন প্রণয় আর দৈহিক সম্পর্ক-যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার—এই চিন্তা কোনোদিনই ইউজিনের মাথায় উদয় হয় নি। স্টিপানিডার সম্বন্ধে সে কোনো কিছুই ভাবত না। মানে, ভাবনার কোনো অবকাশ বা প্রয়োজন বোধ করত না। টাকা দিত তাকে, এই পর্যন্ত। তার বেশি কিছু নয়।

ইউজিন গোড়ায় গোড়ায় কিছুই জানত না, বুঝতেও পারে নি। তার মাথাতেই ঢোকে নি যে, তার এই গোপন প্রণয়ের কথা আর কেউ আঁচ করেছে অথবা সারা গ্রামে সে খবর রাষ্ট্র হয়ে গেছে। পড়শির দল যে ইতিমধ্যে হাসি-তামাশা শুরু করে দিয়েছে, গ্রামের মেয়েরা স্টিপানিডার সৌভাগ্যে রীতিমতো ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছে, তার আত্মীয়স্বজন এ-বিষয়ে তাকে যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহ দিচ্ছে—এমনকি ইউজিনের দেওয়া টাকায় ভাগও বসাচ্ছে, সে-সব খবর কিছুই জানত না ইউজিন। বুঝতেই পারে নি স্টিপানিডার প্রকৃত মনোভাব। এ-ব্যাপারটাকে সে কত সহজভাবে নিয়েছে—পাপ-পুণ্য জ্ঞানটা তার কতটুকু! আর যেটুকু অন্যায়বোধের দরুন মানসিক অস্বস্তি হত, সেটা বেমালুম চাপা পড়ে গিয়েছে ইউজিনের খোলা হাতের দক্ষিণায়! স্টিপানিডার মনে হত আর পাঁচজনে যখন তাকে হিংসা করছে, তখন মন্দটা কিসের? কাজটা মোটের ওপর নিন্দনীয় নয়, বরঞ্চ ভালোই।

আর ইউজিন ভাবে : এটা হল জৈব প্রয়োজন। স্বাস্থ্যের খাতিরে, নিরুদ্ধ দেহ-ক্ষুধার প্রশমন মাত্র। নিতান্তই দরকারি। নিরুপায় মন আর অবদমিত শরীর-ধর্ম নিয়ে কী করে চালানো সম্ভব? মানে কাজটা ঠিক ভালো নয়, প্রশংসা বা সমাজ-অনুমোদনের বাইরে। কেউ অবিশ্যি মুখে কিছু বলছে না এখনো পর্যন্ত। কিন্তু সবাই, অন্তত অনেকেই জেনে ফেলেছে। যে স্ত্রীলোকটিকে স্টিপানিডা সঙ্গে করে আনে, সে তো জানেই। আর, তার জানা মানেই আর দশজনের কাছে খবরটি বেশ রসালো, পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তাহলে এ-অবস্থায় কী করা যায়?

ইউজিন ভাবে—কাজটা ঠিক হচ্ছে না। অন্যায় করাই হচ্ছে—জানি। কিন্তু করি কী? তবে, বেশিদিন আর নয়। এবারে দাঁড়ি টানা দরকার।

ইউজিনের মনে সবচেয়ে বড় অস্বস্তির কারণ হল স্টিপানিডার স্বামীপ্রসঙ্গ। গোড়ায় গোড়ায় সে ভাবত—স্বামীটা নিশ্চয়ই এক হতচ্ছাড়া, বাজেমার্কা লোক—স্টিপানিডার অপছন্দ এবং অযোগ্য। কথাটা ভেবে আত্মতৃপ্তি বোধ করত ইউজিন। যেন স্খলনকে সমর্থনের একটা কিছু নিশ্চিত হেতু খুঁজে পাওয়া গেল। কিন্তু অবাক হয়ে গেল ইউজিন, স্টিপানিডার স্বামীকে একদিন চাক্ষুষ করে। কী চমৎকার, লম্বা-চওড়া, বলিষ্ঠ মানুষ! খাসা ভদ্র পোশাক-আশাক। চলাফেরার ধরনে দিব্যি স্মার্ট বলেই তো মনে হয়। অন্তত ইউজিনের চেয়ে কোনো অংশেই খাটো সে নয়। তবে...

পরের দিন স্টিপানিডার সঙ্গে দেখা হতেই কথাটা পাড়ল ইউজিন। বলল, তার স্বামীকে দেখে সে তো রীতিমতো অবাক হয়ে গেছে। সে যে এ-রকম, তা তো জানত না ইউজিন—ভাবতেই পারে নি।

তৃপ্ত, গর্বিত সুরে জবাব দেয় স্টিপানিডা—'সারা গ্রামে ওর জুড়ি নেই।'

'তাহলে...?' আশ্চর্য বোধ করে ইউজিন। বিস্ময়-স্তব্ধ মনে কেবলি প্রশ্ন জাগে...'তবে কিসের জন্যে...?'

এর পর থেকে চলতে থাকে ক্রমাগত ঐ একই ভাবনা। মনটা চাপা অসহিষ্ণুতায় পীড়িত হয়ে ওঠে খালি খালি। একদিন এমনি খামোকা, দানিয়েলের ছোট্ট কুঁড়েঘরটায় গিয়ে বসল ইউজিন। গল্প জুড়ে দিল বুড়োর সঙ্গে। বুড়ো তো গল্প পেলে আর কিছুই চায় না। এ-কথায় সে-কথায় একসময়ে সোজাসুজি বলে ফেলল দানিয়েল—"মাইকেল তো এই সেদিন আমায় জিজ্ঞাসা করছিল—'আচ্ছা, বাবু কি আমার বৌয়ের সঙ্গে সত্যিই আছেন?' আমি বললুম, অত-শত জানি না। তবে, যদি বৌ

www.BanglaBook.org

তোর নষ্টই হয়ে থাকে, তাহলে চাষির চেয়ে মনিবের সঙ্গে হওয়াই ভালো।"

'তারপর? মাইকেল কী বললে?"

"বললে—'রোসো—আর ক-টা দিন। জানতে ঠিক পারবই একদিন-না-একদিন। তখন মজা টের পাইয়ে দেব মাগীকে' বলে চুপ করে রইল।'

ইউজিন শুনে চুপ করে রইল। ভাবল—'স্বামী যদি ফিরে আসে—এসে গ্রামে বসবাস করে, তাহলে ছেড়ে দেব ওকে।'

কিন্তু মাইকেল থাকে শহরে! গ্রামে ফেরবার কোনো লক্ষণ আপাতত দেখা যাচ্ছে না। তাই চলতে থাকে আগের মতোন। সম্পর্ক ছিন্ন হয় না।

'দরকার পড়লেই ইতি করে দেওয়া যাবে। ওতে আর হাঙ্গামা কিসের? তখন ব্যাপারটা ধুয়ে-মুছে যাবে একেবারে—নিশ্চিহ্ন।'

এই ভেবে নিজেকে আশ্বস্ত করে ইউজিন।

ইউজিনের কাছে এটা অবধারিত সত্য। পরিণতি আর যথাকর্তব্য সম্বন্ধে সে নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত। খতম একদিন করতেই হবে। এমনিই হবে। এমনিই হয়ে যাবে। মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয় অস্বস্তিকর ভাবনাগুলো। চারদিকে তার কত কাজ। সারাটা গ্রীষ্মকাল তার কেটে গেল যেন কোথা দিয়ে। মন আর দেহ নানান কাজে ব্যস্ত, ব্যাপৃত। এদিকে নতুন একটা গোলাবাড়ি আর একটা নতুন মরাই তুলতে হল, ওদিকে ফসল-কাটা, ঝাড়াই-মাড়াইয়ের কাজ। দম নেবার অবকাশ নেই। তার ওপর দেনার দায়—সেগুলো একে-একে চুকিয়ে ফেলা, অকেজো পতিত জমিগুলো বিক্রি করে দেওয়া—এ-সমস্ত কাজে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেল ইউজিন। সারাটা দিন জমি আর ঘর—এক চিন্তা, এক কাজ। ভোরবেলায় বিছানা ছেড়ে ওঠা থেকে শুরু করে রাত্তিরে ক্লান্ত দেহ নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়া পর্যন্ত একটুও ফাঁক নেই। অবসর মেলে না অন্য চিন্তার।

এই তো কাজ—আর এই নিয়েই তো জীবন। বাস্তব, সত্য।

স্টিপানিডার সঙ্গে তার যে সম্বন্ধ—সম্পর্ক বলে সেটাকে চিহ্নিত করতে চায় না ইউজিন—সেটার দিকে নজর দেবার, মন ফেরাবার সময়ই পাওয়া যায় না। অবিশ্যি এটা সত্যি যে, স্টিপানিডাকে দেখবার আকাঙ্ক্ষা, তার কাছে যাবার ইচ্ছা যখন জেগে উঠত ইউজিনের, অস্থির হয়ে পড়ত সে। এমন জোরে, এমন আকস্মিকভাবে সে-দুর্বার কামনা এসে তাকে নাড়া দিয়ে যেত, রীতিমতো ধাক্কা দিয়ে যেত যে, ইউজিন সামলাতে পারত না নিজেকে সেই সময়ে। অন্য কোনো চিন্তাই তখন মগজে ঢুকত না। উগ্র আকাঙ্ক্ষায় সে ছটফট করত, উন্মথিত হৃদয় আর কামনাক্লিষ্ট শরীরটাকে নিয়ে সে যে কী করবে, তা ভেবে ঠিক করতে পারত না। তবে এই অবস্থা এই মনোভাবটা বেশিদিন ধরে থাকত না—এই যা রক্ষে। একটা ব্যবস্থা করে নিত ইউজিন—কোনো একটা দিন সুযোগ-সুবিধামতো কাছে পেতে স্টিপানিডাকে। তারপর দিনের পর দিন, সপ্তাহভর কেটে যেত—এমনকি, মাসাবধিকাল পেরিয়ে যেত। ইউজিনের আর চাহিদা থাকত না, ভুলে যেত স্টিপানিডার কথা।

শরৎকাল এসে পড়ল। ইউজিন এই সময়টা প্রায়ই ঘোড়ায় চড়ে যেত শহরে। যাতায়াতের ফলে অ্যানেনস্কি নামে এক পরিবারের সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয় হল। ক্রমে সে পরিচয়টা দাঁড়াল অন্তরঙ্গ বন্ধুতায়। অ্যানেনস্কি পরিবারের একটি মেয়ে ছিল। 'ইনস্টিটিউট' থেকে সবে সে বেরিয়েছে। বড়লোক আর অভিজাত জমিদারবাড়ির মেয়েদের জন্যে বোর্ডিং-স্কুল গোছের প্রতিষ্ঠান হল এই ইনস্টিটিউট। সেখানে ছাত্রীদের চালচলন, বেশভূষা, সামাজিক শিষ্টাচার প্রভৃতি কায়দা-কানুনের দিকেই নজর দেওয়া হয় বেশি। এমনতর প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা শেষ করে মেয়েটি ফিরেছে। তাই ইউজিন যখন লিজা অ্যানেনস্কায়ার সঙ্গে প্রেমে পড়ল, আর তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে বসল, তখন তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই ছিল না। কিন্তু দুঃখ পেলেন সবচেয়ে বেশি ইউজিনের মা। ব্যাপার দেখে মেরি পাভলোভনা অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। স্বপ্নভঙ্গের আঘাতে তিনি ভাবলেন, ইউজিন নিজেকে এতখানি খেলো করল কী করে!

এই সময় থেকেই এধারে স্টিপানিডার সঙ্গে ইউজিনের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হল।

www.BanglaBook.org

৫

ইউজিন কেন যে এত দেশ আর এত মেয়ে থাকতে লিজা অ্যানেনস্কায়াকেই পছন্দ করে বসল—তার উত্তর দেওয়া অসম্ভব।

কোনো পুরুষ যখন একটি বিশেষ মেয়েকে পছন্দ করে, তখন তার কারণ খুঁজে বার করা শক্ত। এই ক্ষেত্রে কারণ অবিশ্যি ছিল—কয়েকটা সপক্ষে, কয়েকটা বিপক্ষে।

প্রথম কারণ হল—লিজা ধনীর ঘরের উত্তরাধিকারিণী কন্যা নয়, আদরের দুলালীও নয়, ইউজিনের মা যা একান্ত মনেই কামনা করেছিলেন। আরেকটি কারণ হচ্ছে—লিজা সরল প্রকৃতির মেয়ে, ছলাকলার ধার ধারে না। লিজার মা মেয়েকে যেভাবে চালান, তাতে মেয়ের প্রতি সহানুভূতি হওয়াই স্বাভাবিক। তা ছাড়া, লিজা এমন কিছু চটকদার সুন্দরী নয়, যাতে সকলের চোখ পড়ে তার ওপরে। সাদামাঠা চেহারা, তবে দেখতে এমন কিছু খারাপও নয়—এই পর্যন্ত। কিন্তু লিজাকে ইউজিন যে পছন্দ করল, তার প্রধান কারণ হল এই—লিজার সঙ্গে তার আলাপ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল এমন একটা সময়ে যখন ইউজিন বিয়ের জন্যে প্রস্তুত হয়েছে। মনে-মনে সাংসারিক এবং গার্হস্থ্যজীবনের জন্যে সে তখন তৈরি হয়ে উঠেছে। বিয়ে করা দরকার এবং বিয়ে করবে...এই জেনে আর ভেবেই ইউজিন প্রেমে পড়ল, জানাল তার প্রস্তাব।

প্রথমটা শুধু ভালো-লাগার পালা। অর্থাৎ লিজা অ্যানেনস্কায়াকে দেখতে এমনি বেশ ভালো লাগত ইউজিনের। ক্রমশ সেই ভালো-লাগার ফিকে ভাবটা গাঢ় হয়ে জমতে লাগল। যখন লিজাকে স্ত্রী-হিসেবে গ্রহণ করাই স্থির করল ইউজিন, তার প্রতি মনোভাবটা সেই সঙ্গে পরিবর্তিত হতে লাগল, রূপান্তরিত হল হৃদয়ের গভীরতর আকর্ষণে। ইউজিন বুঝল—এটা প্রণয়। লিজাকে সে ভালোবেসেছে।

লিজার আকৃতি দীর্ঘ, ছিপছিপে ও পাতলা। তার শরীরের সবকিছুই একটু পাতলা আর লম্বাটে ধাঁচের। তার মুখের গড়ন, তার নাক উঁচু না হয়ে যেভাবে নিচের দিকে নেমে এসেছে, তার আঙুলের ডগা ও পায়ের পাতা—সমস্ত অবয়বই পেলব এবং দীঘল। মুখের রঙটায় কিসের যেন সূক্ষ্ম আভাস—ফিকে-হলদে সাদায় মেশা আর তারি সঙ্গে লালচে গোলাপি। চুলগুলি বেশ লম্বা, ঈষৎ বাদামি রঙের। নরম আবার কোঁকড়ানো। আর চোখ দুটি তার সত্যিই সুন্দর—পরিষ্কার দীপ্তি ও মধুর আবেশে উজ্জ্বল। নম্র তার চাউনি, কোমল দৃষ্টিতে অনুমান ও বিশ্বাসপ্রবণতার স্পর্শ।

এই হল লিজার শারীরিক কাঠামোর বর্ণনা, তার বাহ্য আকৃতির পরিচয়। যেটা ইউজিন চোখের সামনে সর্বদাই দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু তার আত্মার খবর—অর্থাৎ দেহাতিরিক্ত মনের সংবাদ? সে সম্বন্ধে ইউজিন কিছুই জানে না—বলতে পারে না। কেবল দেখতে পায় তার চোখ দুটি। সে-দৃষ্টিতে জবাব পেয়ে যায় ইউজিন। মনের গোপন কোণে যা-কিছু জিজ্ঞাসা আছে তার সব প্রশ্নের ইঙ্গিত-সমাধান মিলে যায় যেন লিজার চোখে। আর সে চোখের দৃষ্টি আর বৈশিষ্ট্য ও অর্থ হল এই : লিজা যখন ইনস্টিটিউটের ছাত্রী হিসেবে বোর্ডিং-স্কুলে থাকত, বয়েস আন্দাজ পনের—তখন থেকেই সে ক্রমাগত প্রেমে পড়েছে। সুপুরুষের আকর্ষণ ছিল তার কাছে অত্যন্ত গভীর। প্রেমে না পড়লে তার সুখ হত না—প্রণয়াস্পদের চিন্তাতেই তার শান্তি, উত্তেজনা, জীবনের আনন্দ আর সার্থকতা। ইনস্টিটিউট ছেড়ে যখন লিজা বাড়ি ফিরল, তারপর থেকে যত যুবাপুরুষের সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয়, দেখাশোনা হয়েছিল, সকলের সঙ্গেই ঠিক একইভাবে প্রেমে পড়তে লাগল। কাজেই ইউজিনের সঙ্গে পরিচয় হওয়া মাত্রই, লিজা তাকে ভালোবেসে ফেলল। অনবরত প্রেমে পড়ে আর ভালোবাসার উদ্বেল ঢেউয়ের ওপর নিত্য ভেসে থাকতে থাকতে তার চোখ দুটিতে ভেসে উঠল এমন একটা বিশেষ ধরনের দৃষ্টি, একটা টলটলে ভাসা-ভাসা চাউনি—যে ইউজিন তাতেই মজল, ডুবল এবং জড়িয়ে গেল নিথর চোখের দীঘল পালকের জালে।

এই শীতকালেই, ইতিমধ্যে লিজা দু-জায়গায় প্রেমে পড়েছে। দু-জায়গায় এবং একই সঙ্গে। যুগপৎ দুটি যোগ্য পাত্রে হৃদয় দানের ফলে সময়টা কাটছিল লঘূর্মি নদীর একটানা স্রোতের মতই। দু-জনেই সুদর্শন যুবক। তারা কাছে এলেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠত লিজা। তার ঘরে ঢুকলেই

www.BanglaBook.org

উত্তেজনায় বুক টিপটিপ করে উঠত। এমনকি তাদের নামোল্লেখ মাত্রেই শুরু হত লিজার হৃদয়-চাঞ্চল্য।

কিন্তু পরে, লিজার মা একদিন সুযোগ বুঝে ইঙ্গিত করলেন মেয়েকে। বললেন, আর্তেনিভ পাত্র হিসেবে কিছু ফেলনা নয়। উপরন্তু তার উদ্দেশ্য সৎ। প্র্যাকটিক্যাল লোক, বিবাহ করাটাই তার সত্যিকারের অভিপ্রায়। অমনি লিজা স্থির, ধীর ও গম্ভীর হয়ে গেল। ইউজিন আর্তেনিভের প্রতি শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায় তার মন পূর্ণ হয়ে উঠল। ভালোবাসতে শুরু করল ইউজিনকেই। প্রণয়ের মাত্রা ও গভীরতা বাড়তে লাগল ক্রমে ক্রমে। অবশেষে লিজা তার পরম অনুরক্ত ভক্ত হয়ে উঠল। পূর্ববর্তী দু-জন প্রণয়াস্পদের প্রতি তার আকর্ষণের জোর গেল কমে—ক্রমশ সেটা দাঁড়াল শিথিল উদাসীন মনোভাবে। এর পরে যখন ইউজিন হামেশাই অ্যানেনস্কি পরিবারে যাতায়াত করতে লাগল, ঘন ঘন আসতে শুরু করল তাদের বল-নাচে আর পার্টিতে, তখন লিজার উত্তেজনাও বাড়তে লাগল সেই অনুপাতে। ইউজিন তাদের বাড়ি এসে তারই সঙ্গে কথা কয়, নাচে যোগ দেয় বেশি করে,—জানতে চায় লিজা তাকে ভালোবাসে কি না, তারি পিছু-পিছু ঘোরাফেরা করে। এ-সমস্ত দেখে-শুনে লিজার প্রেমও গভীর হয়ে উঠল। শুরু হল শয্যাকণ্টক, মানসিক ছটফটানি—পুলকের আনুষঙ্গিক, অকারণ বেদনা। নিদ্রায় আর জাগরণে লিজার মনে ঐ এক চিন্তা—ইউজিন। ঘুমিয়ে তাকে স্বপ্ন দেখে, আবার জেগে-জেগেও তাকে দেখতে পায়। অন্ধকার ঘরে বসে চোখ মেলে লিজা যেন স্পষ্ট দেখতে পায় ইউজিনকে। আর অন্য সব মানুষ ভেসে যায়—সব কথা ভুলে যায়। অস্পষ্ট, অদৃশ্য হয় আশপাশের জিনিস। কেবল একটি মানুষ, হৃদয়ের ঘটাকাশে স্ফীতালোকের মধ্যবর্তী যেন একটিই মানুষ—উজ্জ্বলতম বিন্দু হয়ে ফুটে থাকে...ভাস্বর, অম্লান।

তারপর যখন ইউজিন বিয়ের প্রস্তাব জানাল, তখন উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে তারা বাগদত্ত হল। পরস্পর চুম্বন করে তারা আবদ্ধ হল পবিত্র চুক্তিতে। সবাই জানল তাদের 'এনগেজমেন্টের' কথা। এর পর থেকে লিজার মনে ইউজিন ছাড়া আর দ্বিতীয় চিন্তা রইল না। ইউজিনের সঙ্গ ছাড়া আর কারুর সংসর্গ ভালো লাগত না তার। ইউজিনকে ভালোবাসা আর ভালোবাসার প্রতিদান পাওয়া ছাড়া লিজার মনে আর অন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। ইউজিনের প্রেম-স্পর্শ-ধন্যতাই তার জীবনের একান্ত কামনা হয়ে দাঁড়াল।

ইউজিনকে নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু করল লিজা। শুধুই ভবিষ্য-পতিগত-প্রাণা হয়ে সে ক্ষান্ত রইল না। ইউজিন সম্বন্ধে তার অস্বাভাবিক গর্ব। নিজের আর বাগদত্ত স্বামীর কথায়, উভয়ের প্রণয়-স্বপ্নে সে একাই বিভোর হয়ে উঠল। হৃদয় হল ভাবপ্রবণ। প্রীতির সুধারসে অভিষিক্ত হয়ে যেন থেকে-থেকে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে লিজা। আবেগের আতিশয্য এক-এক সময়ে যেন সহন-সীমা লঙ্ঘন করে যায়। স্বপ্নের ঘোর আর কাটতে চায় না—

যত দিন যায়, তত প্রেম বাড়ে। ইউজিন লিজাকে যত চিনতে থাকে, ততই মুগ্ধ হয়ে যায়। এতখানি প্রেম যে একটি ছোট বুকের ভিতর বাসা বেঁধে আছে তারি জন্যে, সে-কথা সে ভাবতেও পারে নি। এ যেন অপ্রত্যাশিত প্রণয়ের বন্যা। আরেকজনের ভালোবাসার দৃঢ়তায়, সরল সহজ বিশ্বাসে আর বিকাশে নিজের ভালোবাসাও উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে।

৬

শীতকাল কাটল এইভাবে, বসন্ত এসে পড়ল। আর বসে থাকলে চলে না।

ইউজিন বেরিয়ে পড়ল কাজের তাগিদে। সেমিয়োনভ তালুকটা একবার ঘুরে আসা দরকার। কী হচ্ছে না হচ্ছে ওদিকটায় দেখা উচিত। নায়েব-গোমস্তা-আমলাদের সাক্ষাতে একটু উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন, মহালের কাজ ভালোমতো চলছে কিনা, তদারক করা উচিত। তা ছাড়া ওখানকার পুরানো কুঠিটা অসংস্কৃত অবস্থায় পড়ে আছে বহুদিন। এদিকে বিয়ের দিন এগিয়ে এল। এবারে কুঠিটাকে ঝালিয়ে মেরামত করতে হবে, বিয়ের আগেই সাজিয়ে-গুছিয়ে ফেলতে হবে।

মেরি পাভলোভনার মনে কিন্তু শান্তি নেই, সন্তোষ নেই। অপ্রসন্ন চিত্ত, খুঁতখুঁত করছে সর্বদাই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছেলের পছন্দের বহর দেখে। আজীবন সঙ্গিনী হিসেবে ইউজিন যাকে নির্বাচন করল, মেরি তাকে পুরোপুরি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারছেন না। ছেলের ভবিষ্যৎ, তার বিবাহ সম্বন্ধে কত উজ্জ্বল স্বপ্ন আর আশা তাঁর ব্যর্থ হয়ে গেল! বিয়েটা যতখানি তাক-লাগানো ব্যাপার হবে বলে আঁচ করে রেখেছিলেন, এ যেন তার কাছে কিছুই নয়। নেহাতই মিইয়ে-যাওয়া একটা ঘটনা, আর দশজনের বৈচিত্র্যহীন জীবনে যেটা হামেশাই ঘটছে। খুঁতখুঁতুনির আরও একটা কারণ ছিল মায়ের মনে। ছেলের বিয়ে একটা মস্ত বড় ঘটনা—জাঁকজমক আর আড়ম্বরে পূর্ণ এবং সার্থক হয়ে উঠল না—সে আক্ষেপ তো ছিলই, উপরন্তু ইউজিনের শাশুড়ি-ভাগ্যে তিনি আনন্দিত হতে পারলেন না। ভার্ভারা আলেক্সিভনা মোটেই তাঁকে সন্তুষ্ট এবং প্রীত করতে পারেন নি। ইউজিনের শাশুড়ি হিসেবে তাঁকে মনোনীত করা চলে না। নিজের থাকের লোক নন। আগামী দিনের সম্পর্ক ধরে তাঁকে সম-স্তরের শ্রদ্ধা বা বিবেচনায় আপ্যায়িত করতে মন তাঁর দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠছে।

মেয়ের মা কী ধরনের মানুষ—তাঁর স্বভাব-প্রকৃতিই বা কী ধাঁচের, তার কোনো খবরই জানেন না মেরি পাভলোভনা। সে-সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তই তাঁর মনে তৈরি হয় নি। কেবল এইটুকু বলতে পারেন যে, তাঁর আচার-ব্যবহার অভিজাত ঘরের মহিলাদের মতোন নয়। প্রথম দৃষ্টি ও আলাপেই মেরি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভার্ভারা আলেক্সিভনাকে ঠিক 'লেডি' নামে অভিহিত করা যায় না, অন্তত তাঁর রুচি ও চালচলনকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে বাধে। এইখানেই মেরির আপত্তি আর মনঃকষ্ট। মনোদুঃখের প্রধান কারণ হল মেয়ের মা উঁচু থাকের নন। সারাটা জীবন মেরি চালচলন আর সহবৎ শিক্ষাকেই উঁচু আসন দিয়ে এসেছেন। শিক্ষা-দীক্ষা-রুচি ও সংস্কার, ভদ্রতা-বোধ এবং শালীনতাকেই তিনি প্রাপ্যেরও অধিক মর্যাদা দিয়ে এসেছেন। আজ তাই এতটা নামতে হবে ভেবে, তিনি মনে মনে কষ্ট পান। দুঃখ বোধ করেন ইউজিনের জন্যে। ইউজিনও খুঁতখুঁতে লোক—সূক্ষ্ম তার স্নায়ু। নির্ভুল চালচলনের এতটুকু এদিক-ওদিক সহ্য করতে পারে না। এই দিক থেকে ভবিষ্যতে তাকে অনেকখানি বিরক্তি ও হাঙ্গামা পোয়াতে হবে। অসমান সামাজিকতার জন্যে তাকে কষ্ট পেতে হবে—দেখাই যাচ্ছে। তবে সুখের বিষয়, লিজাকে মেরির ভালো লাগে...বেশ পছন্দসই!

ইউজিন লিজাকে এতটা পছন্দ করে—সেও একটা কারণ অবিশ্যি। তা ছাড়া লিজার মতোন মেয়েকে ভালো না বেসে উপায় নেই। ওর সঙ্গে মেলামেশা করলেই পছন্দ ও তারিফ করতে হয়। আর লিজাকে ভালোবেসে গ্রহণ করবার জন্যে মেরি পাভলোভনা তো প্রস্তুত হয়েই আছেন। সেটা সত্যিই আন্তরিক সদ্ভাব থেকে।

ইউজিন দেখতে পেল যে, তার মা সুখী এবং তৃপ্ত হয়েছেন। আসন্ন বিবাহের চিন্তায় ও জল্পনায় তিনি রীতিমতো ব্যস্ত, মেজাজও তাঁর প্রসন্ন। বাড়িতে সবকিছু গোছগাছ করে, ঘর-সংসার গুছিয়ে দিতেই তিনি অধিকাংশ সময় ব্যয় করছেন। খালি নতুন গৃহিণীর আসার প্রতীক্ষায় আছেন। বৌ এলেই তার হাতে সংসার আর ছেলের ভার সমর্পণ করে চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছেন মেরি। অবিশ্যি এই-ই নিয়ম। কিন্তু ইউজিন তাঁকে অনেক বুঝিয়েছে। আর কিছুদিনের জন্যে নতুন সংসারে থেকে যাবার অনুরোধ জানিয়েছে। চেষ্টা করেছে মাকে বুঝিয়ে-পড়িয়ে রাজি করাতে। মেরি এখনো কিছু শেষ কথা বলেন নি। ভবিষ্যতে, অর্থাৎ বিয়ের পরে, সাংসারিক ঝিকি-বন্দোবস্ত সম্বন্ধে এখনো পাকাপাকি কিছু ঠিক হয় নি।

সন্ধেবেলায় চা খাবার পরে, মেরি পাভলোভনা বসে বসে 'পেশেন্স' খেলছিলেন একমনে। পাশে বসে ইউজিন তাস গুছোচ্ছিল। এই সময়টাই যা নিরিবিলি। মা ও ছেলে একত্র মুখোমুখি বসে দু-দণ্ড আলাপ-আলোচনা করতে পায়, মনের কথা খুলে বলবার সুযোগ পায়।

এক দান খেলা শেষ করে তাসগুলো ফের ভাঁজাতে ভাঁজাতে মেরি পাভলোভনা ছেলের দিকে একবার তাকালেন। তারপর একটু যেন ইতস্তত করে ইউজিনকে বললেন,—'জেন্যা, তোমাকে একটা কথা বলব ভাবছিলুম। মানে—এমনি সাধারণভাবে বলছি। আমি অবিশ্যি জানি না তুমি আবার কীভাবে নেবে। তবে পরামর্শ হিসেবে খালি বলছি যে, বিয়ে হবার আগেই, তোমার অন্য যদি কোনো ব্যাপার থাকে...মানে, বিয়ের আগে সুস্থ জোয়ান ছেলে—এমনি কত লোকের কত

www.BanglaBook.org

ব্যাপারই তো ঘটে যায়! তাই বলছি, সেইরকম যদি কিছু হয়ে থাকে তোমার, তাহলে ওসব চুকিয়ে দেওয়াই ভালো। মানে—পরে যেন এই নিয়ে তোমাকে কিংবা তোমার স্ত্রীকে আফসোস করতে না হয়। ভগবান করুন—সে-রকম যেন কিছু না হয়—তোমাদের কাউকেই পস্তাতে না হয়। তবে আগে থাকতে সাবধান হওয়া ভালো, পুরানো জিনিসের জের রাখতে নেই—ঝেড়ে-পুঁছে জঞ্জাল সাফ করে দিতে হয়—বুঝলে কিনা!'

বলা বাহুল্য, ইউজিন বেশ ভালোভাবেই বুঝেছিল এবং তক্ষুনি ধরতে পেরেছিল, মা কী বলতে চাইছেন। স্টিপানিডার সঙ্গে গত শরৎকালে তার যে ব্যাপার চুকে-বুকে গেছে, মা যে সেই গোপন সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত করছেন, এটুকু বোঝবার মতো তার বুদ্ধি আছে। বিবাহিতা মহিলারা এসব ব্যাপারে তেমন নজর দেন না। কিন্তু যাঁরা একলা, বিধবা কিংবা আজীবন কুমারী—তাঁদের দৃষ্টিটা স্বভাবতই তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে। এইসব অবৈধ সম্পর্ক হাজার সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী হলেও, তাঁদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।

তাই ইউজিন লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল, মেরি পাভলোভনা যেই কথাটার উল্লেখ করলেন। তবে লজ্জার চেয়ে অপ্রস্তুত আর বিরক্তির ভাবটাই যেন বেশি। কেন না, যদিও তিনি মা এবং মা হয়ে সন্তানের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সুখের চিন্তায় মাথা ঘামানো খুবই ন্যায্য এবং স্বাভাবিক, তবুও তিনি অকারণে একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, এটা ইউজিনের মোটেই ভালো লাগল না। এমন একটা ব্যাপার, যেটা ইউজিনের একান্ত নিজস্ব এলাকার। ব্যক্তিগত জীবনের যে নগণ্য একটা অধ্যায় নিজ হাতেই শেষ করে মুড়ে ফেলেছে—তা নিয়ে অযথা চিন্তিত অথবা শঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। যে-জিনিস মা বুঝেও ঠিক বুঝবেন না, ছেলের সামনে সে প্রসঙ্গের উল্লেখ একটু অশোভন। ইউজিনের মন তাই এই আলোচনায় ঈষৎ বিরক্ত এবং সঙ্কুচিত হয়ে উঠল।

তবু সরল ও সহজ গলায় ইউজিন বললে তার মাকে, 'এমন কিছু আমার জীবনে ঘটে নি, মা, যেটাকে গোপন করার প্রয়োজন হয়। অন্তত এমন কোনো কাজ করেছি বলে মনে পড়ে না যেটা একদিন অস্বস্তির কারণ হতে পারে বলে লুকোচাপা করতে হবে এখন থেকে। বিয়ে করার বিপক্ষে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করি নি নিজ হাতে, এটুকু তোমায় বলতে পারি।'

'আচ্ছা, আচ্ছা,—তাহলে তো ভালোই, বাবা। আমার আর চিন্তা কিসের! তুমি যেন কিছু ভেব না, জেন্যা—মানে, আমার ওপর বিরক্ত হয়ো না—তোমার কথায় কথা বলছি বলে—' মেরি পাভলোভনা সহসা অপ্রতিভ হয়ে পড়েন। নিজের অপ্রস্তুত ভাবটা সামলাবার জন্য কৈফিয়ৎ দিয়ে কথা ঢাকবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু ইউজিন স্পষ্টই বুঝতে পারল, মা-র বক্তব্য এখনো শেষ হয় নি। কথাটা চাপা দেওয়া হল মাত্র, নইলে আরো কী যেন বলবার ছিল...

ইউজিন যা ভেবেছিল তাই-ই ঠিক। একটু পরেই, ঈষৎ থেমে, মেরি পাভলোভনা বলতে শুরু করেন। বলেন, ইউজিন যখন বাড়িতে ছিল না পেশনিকভ-রা ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তাঁকে ধর্ম-মা হবার জন্যে।

ইউজিনের মুখমণ্ডল রক্তাভ হয়ে ওঠে। ঠিক লজ্জা নয়—বিরক্তিও নয়। একটা জটিল মনোভাব। মা তাকে যা বলতে চাইছেন, সেটা-যে বিশেষ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ, এটা সে বেশ বুঝতে পারছে। অথচ এ-সম্বন্ধে তার নিজস্ব মতামত ও ধারণা অন্যরকম। তবু, মনের মধ্যে একটা সচেতনতা ঘনিয়ে উঠছে—একটা কিছু জরুরি খবর আসছে—দ্বিধায়, সতর্কতায় আর প্রতীক্ষায় মনের সূক্ষ্ম তারগুলো থেকে-থেকে কম্পিত হচ্ছে।

কথার পিঠে কথা আসে। মেরি পাভলোভনা বলে চলেন: 'এ-বছরে দেখছি কেবল ছেলের পালা। সব বাড়িতেই খোকা হচ্ছে শুনতে পাই। ভ্যাসিনদের বাড়িতে নতুন বৌয়ের খোকা হয়েছে...আবার পেশনিকভদের বৌ, তারও প্রথম ছেলে হয়েছে...এবার যে-রকম ছেলের দল জন্মাচ্ছে, তাতে মনে হয়, শিগগিরই বোধ হয় যুদ্ধ বাধবে, না?'

কথাচ্ছলে প্রসঙ্গটা এসে পড়ে। মেরি পাভলোভনা এমন সহজ সুরে কথাগুলো বলেন, যেন কিছুই

www.BanglaBook.org

হয় নি।

অথচ বেশকিছুই যে হয়েছে সেটা ইউজিনের মুখ দেখলেই মালুম হয়। ছেলের মুখখানা সঙ্কোচে আর চাপা লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠছে দেখে মেরি পাভলোভনা মনে মনে কুণ্ঠিত হন। আড়-চোখে দেখেন ইউজিনের অস্বস্তি—তার বিব্রত ভাবখানা। এটা নাড়ছে, ওটা সরাচ্ছে, টেবিলের ওপর অন্যমনস্কভাবে আঙুল দিয়ে টকটক আওয়াজ করছে। চোখ থেকে প্যাঁসনেটা একবার খুলছে, আবার তখুনি চোখে লাগাচ্ছে। তারপর হঠাৎ একটা সিগারেট ধরিয়ে খুব খানিকটা ধোঁয়া টেনে নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

মেরি পাভলোভনা চুপ করে থাকেন। ইউজিন নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। ঘরের মধ্যে একটা চাপা অস্বস্তি। কেমন করে এই অস্বস্তিকর নিঃশব্দতা ভঙ্গ করা যায়, ভেবে পায় না ইউজিন। কেউই নিজে থেকে কথা বলতে আর ভরসা পাচ্ছে না। উভয় পক্ষই বুঝতে পারে, তারা পরস্পরের মনের কথা বুঝতে পেরেছে।

'আসল কথা কি জানো—সুবিচার। দেখতে হবে,—আর দেখাই উচিত—গ্রামের মধ্যে যেন কোনো অন্যায়-অবিচার না হয়। কারুর হয়ে পক্ষপাতিত্ব করাটা মোটেই সঙ্গত নয়। মানে—তোমার ঠাকুর্দার আমলে যে-রকম অবস্থা ছিল, সেইরকম মেনে চলাই উচিত। নইলে, অকল্যাণ...' মেরি অনেকটা স্বগতই বলে চলেন, কথার জের টেনে অপ্রীতিকর অবস্থাটা দূর করতে চান।

'দেখ মা', ইউজিন হঠাৎ বলে উঠল, 'তুমি যে কেন এসব বলছ, তা আমি বুঝতে পেরেছি। তবে একটা কথা তোমায় বলি। তুমি শুধু শুধু চিন্তিত হয়ো না। তুমি এটুকু জেনো যে, আমার চোখে ভবিষ্যৎ জীবনের নিশ্চিন্ততা অর্থাৎ আমার দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতার মূল্য অনেকখানি। আর সেটাকে নষ্ট হতে আমি কোনোমতেই দেব না। আর তুমি যে-কথা ভেবে অকারণে ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হচ্ছ—আমার অবিবাহিত জীবনে যদি কোনো অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার ঘটে থাকে বলে—তার উত্তরে বলতে চাই যে, সে-সব চুকে-বুকে গেছে। কখনো কোনো দিনই কারুর সঙ্গে আমার স্থায়ী সম্পর্ক গোছের কিছু গড়ে ওঠে নি। তাই আমার ওপরে কোনো দাবি-দাওয়া কারুর নেই, থাকতে পারে না।'

'বাঁচলুম', মেরি পাভলোভনা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন। 'শুনে সত্যিই খুশি হলুম। তোমার মন যে কতখানি উঁচু তা তো আমি জানি।'

ইউজিন চুপ করে রইল। এর পরে আর কোনো কথা কইল না। মা যা-যা বললেন আর তার মহত্ত্বের যে-প্রশংসা করলেন, সেটা সর্বতোভাবেই তার প্রাপ্য জেনে প্রসন্ন-মনেই গ্রহণ করল ইউজিন।

পরের দিন ইউজিন যাচ্ছিল শহরে গাড়িতে করে। মনে-মনে ভাবছিল তার বাগদত্তা বধূর কথা। স্টিপানিডার কোনো প্রসঙ্গ-চিন্তাই তার মাথায় তখন উদয় হয় নি। কিন্তু ইউজিনের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার জন্যেই যেন ইচ্ছাকৃত একটা অবস্থার সৃষ্টি হল।

গির্জের দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে ইউজিনের নজরে পড়ল, অনেক লোকের সমাবেশ হয়েছে। অধিকাংশ লোকই গির্জে থেকে গ্রামের দিকে ফিরছে—কেউ-বা হেঁটে, কেউ-বা গাড়িতে ঘরমুখো চলেছে। রাস্তায় দেখা হয়ে গেল বুড়ো ম্যাতভি আর সাইমনের সঙ্গে—ওরা বাড়ি ফিরছে। আরো কয়েকজন ছেলে-ছোকরা...অল্পবয়সী মেয়ের দল, হাসাহাসি আর গল্প করতে করতে চলেছে। ও-দলটির পিছনে পিছনে আসছে দু-জন স্ত্রীলোক, ইউজিন দূর থেকে নজর করল। ওদের মধ্যে একজন প্রৌঢ়া গোছের—আধাবয়সী ও ভারিক্কি চালের। আরেকজনের বয়স কাঁচা। বেশ সপ্রতিভ গতিভঙ্গি—পরনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক। মাথায় টকটকে লাল রেশমি রুমাল বাঁধা। চেহারাটা খুব চেনা-চেনা মনে হল ইউজিনের। কিন্তু ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি বলে ঠিক ঠাহর করতে পারল না।

ইউজিনের গাড়ি যখন ওদের কাছাকাছি এগিয়ে এল, প্রৌঢ়া মেয়েমানুষটি রাস্তার একপাশ ঘেঁষে সরে দাঁড়াল। পুরানো প্রথামতো অনেকখানি মাথা নিচু করে অভিবাদন জানাল ইউজিনকে। আর অল্পবয়সী স্ত্রীলোকটি—কোলে একটি শিশু নিয়ে যে এতক্ষণ লঘু অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে হেঁটে আসছিল—সে শুধু একটিবার মাথা নত করল ঈষৎ হেলিয়ে। লাল রুমালটার নিচে থেকে দেখা

www.BanglaBook.org

যাচ্ছে—চকচক করে উঠল একজোড়া পরিচিত চোখ, হাসিতে আর কৌতুকের দীপ্ত ছটায় উজ্জ্বল।

হ্যাঁ—ইউজিন যা আন্দাজ করেছিল, তাই। স্টিপানিডাই বটে। কিন্তু ওর সঙ্গে সেই পুরানো ব্যাপারটা তো চুকে-বুকে গেছে। এখন ঝাড়া হাত-পা, সব পরিষ্কার। স্টিপানিডার দিকে তাকিয়ে আর লাভ কী?

'কিন্তু ছেলেটা তো আমারও হতে পারে!' ভাবে ইউজিন। এক লহমার জন্যে চিন্তাটা উদভ্রান্ত করে তোলে। পর মুহূর্তেই ঝেড়ে ফেলে দেয় ইউজিন। বলে আপন মনেই : যত সব পাগলামি, মনের প্রলাপ! ওর স্বামী ছিলই বরাবর, এখনো আছে। দেখাশুনো কি হত না পরস্পরের?

এর বেশি আর-কিছু ভাবতে চায় না ইউজিন। উৎকণ্ঠিত মনকে আশ্বস্ত করে তর্কে আর বিচারে। ও সম্বন্ধে চিন্তা শুরু হলে তার আর অন্ত থাকে না। জোর করে মুছে ফেলা দরকার। তা ছাড়া, ও ব্যাপারের শেষবেশ তো হয়েই গেছে। একটা বিষয়ে সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। শরীরের জন্য, স্বাস্থ্যের খাতিরে ওর প্রয়োজন ঘটেছিল একদিন। টাকা দিয়ে ইউজিন মিটিয়ে ফেলেছে যখন, তখন পূর্ণচ্ছেদ পড়ে গেছে। ও সম্বন্ধে বলার কিছু নেই, আর থাকতেও পারে না। এই ধারণাটা বেশ দৃঢ়ভাবেই ইউজিনের মনের ভেতর গেঁথে গেছে। তাই সে ভাবে, স্টিপানিডার সঙ্গে তার স্থায়ী সম্বন্ধ কোনো দিন হয় নি, হতে পারত না এবং নেইও। ভবিষ্যতেও তার কোনো সূত্র ধরে টেনে চলার প্রশ্ন আর উঠতে পারে না। দিন কয়েক নিতান্তই শরীর-ধর্ম পালনের জন্যে একটা ক্ষণিকের দেহ-সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়েছিল। এই পর্যন্ত।

এটা শুধু মনকে চোখ-ঠারা নয়, বিবেককে দাবিয়ে রাখাও নয়। কারণ ইউজিনের বিবেক এ-বিষয়ে নির্বাক, নিষ্কর্মা। তাই মেরি পাভলোভনার সঙ্গে কথাবার্তার পর আর রাস্তায় হঠাৎ দেখা হওয়ার পর থেকে ইউজিন স্টিপানিডার সম্বন্ধে কোনো চিন্তাকেই মনে স্থান দিত না। একটা দিকের দরজা যেন চিরদিনের জন্যে বন্ধ করে দিলে। এর পরে অবিশ্যি দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ আর হয় নি।

ঈস্টারের পরের সপ্তাহে ইউজিনের বিয়ে হয়ে গেল শহরে। বেশ নির্বিঘ্নেই কাজ শেষ হল।

বিয়ের হাঙ্গামা মিটে যাওয়া মাত্রই ইউজিন নতুন বৌকে নিয়ে রওনা হল গাঁয়ের জমিদারিতে। মহালের কুঠিটা ইতিমধ্যে মেরামত করা হয়েছিল। বর-কনে এই বাড়িতে এসে উঠবে বলে তাদের বাসোপযোগী করবার জন্যে কুঠিটাকে যথাসাধ্য সংস্কার করে রাখা হয়েছিল। মেরি পাভলোভনা, যা স্বাভাবিক নিয়ম সেই অনুসারে, ছেলে-বৌয়ের কাছ থেকে সরে অন্যত্র যাবার চেষ্টা করেছিলেন কয়েকবার। কিন্তু ইউজিন আর লিজা—কেউই তাঁকে ছাড়তে চাইল না। দু-জনের মিলিত সনির্বন্ধ অনুরোধে অবশেষে মেরি থাকতে রাজি হলেন। তবে কুঠিরই মধ্যে একটা স্বতন্ত্র অংশে তিনি উঠে গেলেন। সেটা আসল বাড়ি থেকে একটু দূরে, তার ব্যবস্থাও পৃথক। উভয় পক্ষেরই কোনো অসুবিধার কারণ আর রইল না।

এইভাবে শুরু হল ইউজিনের নতুন জীবন...নতুন জীবনের প্রথম পর্ব।

৭

বিয়ের প্রথম বছরটা কাটল কিন্তু কষ্টে। ইউজিনের পক্ষে, নববিবাহিত জীবনের অভূতপূর্ব সুখ-সম্পদ সত্ত্বেও, এক হিসেবে এটা দুর্বৎসরই বলতে হবে বৈ কি!

বিয়ের আগে, বাগদানের পর থেকে কোর্টশিপের সময়টা, ইউজিন চালিয়ে নিয়েছিল একরকম। অর্থাৎ বৈষয়িক ব্যাপারের মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে অপ্রীতিকর, সেগুলো ঠেলেঠুলে ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিল কোনোমতে। কিন্তু আর তা চলল না। হঠাৎ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল ঘাড়ের ওপর। তাল সামলাবার সময়ই পায় না ইউজিন।

দেনার দায় ঠেকানো অসম্ভব হয়ে উঠল। পৈতৃক ঋণ কত দিন আর এড়িয়ে যাওয়া চলে! ঋণ শোধের মেয়াদ বাড়াতে গেলে শোধ আর হয় না, ঋণ থেকেই যায়। মাঝখান থেকে হয় অমূল্য সময়ের অপচয়। এই সাময়িক নিশ্চিন্ততার প্রতারক আরামটুকু ত্যাগ করতেই হবে—দাঁড়াতে হবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের মুখোমুখি।

তাই বিক্রি করা হয়েছিল জমিদারির খানিকটা অংশ। লাভবান তালুকের বারদিকের একটা অংশ ছেড়ে দিতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে। তা থেকে যে-টাকা পাওয়া গিয়েছিল, কর্জের কিছুটা ভাগ তাই দিয়ে শোধ হয়েছিল যেগুলোর জরুরি তাগিদ, সেইগুলো। কিন্তু আরো তো ঋণ আছে—অনেক বাকি এখনো। সেগুলোর কী উপায় হবে? ইউজিন ভেবে কূল পায় না।

তালুকটা রীতিমতো দামি এবং তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আছে যথেষ্ট। খাজনা যা আসে, তা ভালোই। কিন্তু খরচ মিটিয়ে আদায় বাবদ যেটুকু থাকে, তাই দিয়ে সংসারই বা চলে কী করে? আর তালুকটা বাঁচিয়ে রেখে তাকে বাড়ানো, তার উন্নতি সাধন করাই বা সম্ভব হয় কী করে? দাদাকে নিয়মমতো বার্ষিক টাকা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। নিজের বিয়েতেও বেশকিছু খরচ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। হাতে নগদ টাকা নেই বললেই চলে। অথচ বিষয়-সম্পত্তির আনুষঙ্গিক অর্থব্যয় অনিবার্য। কারখানার পেছনে টাকা না ঢাললে কারখানার কাজও অচল। বন্ধ করে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে হবে। টাকা নেই ঘরে। অথচ নগদের প্রয়োজন এখনি। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলেও এদিকে চলে না। কী করা যায়! মহা সমস্যার ব্যাপার!

একটা উপায় আছে অবিশ্যি। লিজার টাকা। তাই থেকে কিছু নিয়ে কাজে লাগানো চলে এখন। আপাতত এ-দায় থেকে তাহলে উদ্ধার পাওয়া যায়। স্বামীর সঙ্কট-অবস্থা দেখে লিজা নিজে থেকেই এগিয়ে আসে। প্রস্তাব করে, অনুরোধ জানায় ইউজিনকে। বলে, 'টাকা তো পড়েই আছে, নাও না। নেবে না কেন, এতে আপত্তির কী থাকতে পারে?' পীড়াপীড়ি শুরু করে দেয় লিজা, বলে টাকা তোমায় নিতেই হবে।

শেষকালে ইউজিন রাজি না হয়ে পারে না। সম্মত হয়, নিমরাজি হয় টাকাটা নিতে। তবে একটা শর্ত আছে ইউজিনের। ও টাকা ধার হিসেবে নিতে পারে সে। নইলে নয়। আর তার পরিবর্তে, বিষয়ের অর্ধেকটা বন্ধকি হিসেবে নিতে হবে লিজাকে। শেষ পর্যন্ত ইউজিন তার নিজের জেদ বজায় রেখে ছাড়ল। তবে ইউজিন যে এতখানি করল, অর্থাৎ সম্পত্তির অর্ধেক অংশ বন্ধক রাখল লিজার কাছে লেখাপড়া করে, তার বিশেষ কারণও একটা ছিল। কারণটা স্ত্রী নয়। কেননা, এই লেনদেনের ব্যাপারে লিজা রীতিমতো ক্ষুণ্ন হয়েছিল। কারণটা আসলে হল শাশুড়ির মনস্তুষ্টি। স্ত্রীর টাকা নেওয়া তিনি কী চোখে দেখবেন, কে জানে!

এইসব ব্যাপারে প্রথম বছরটা কাটল দারুণ অশান্তির মধ্য দিয়ে। কখনো ভাগ্য মুখ তুলে চেয়েছে, কখনো-বা মুখ অন্ধকার করেছে। লাভের সঙ্গে ক্ষতির অঙ্কটাও সামান্য হয় নি। ভালোয়-মন্দয়, লাভে আর ক্ষতিতে, আশায় এবং দুর্ভাবনায়,—আর সবচেয়ে যেটা বিশ্রী, বিষয়-কারবার সবকিছু একসঙ্গে ফেঁসে যাওয়ার নিত্য বিপদাশঙ্কায়, দাম্পত্য জীবনের প্রাথমিক মিষ্টতাটুকুও তিক্ত এবং বিস্বাদ হয়ে উঠল।

এর ওপর আর-এক দুশ্চিন্তা। স্ত্রীর স্বাস্থ্যভঙ্গ।

বিয়ের বছরেই, বিয়ের মাস সাতেক বাদে—শরতের এক সন্ধ্যায় এক দুর্ঘটনা ঘটল লিজার। স্বামী ফিরবেন শহর থেকে। তাঁকে স্টেশন থেকে নিয়ে আসবার জন্যে লিজা বেরিয়েছিল গাড়ি নিয়ে। কিন্তু আগ-বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে ঘটল এক বিপদ। ঘোড়াটা এতক্ষণ বেশ শান্তই ছিল, চলছিল ঠিক কদম ফেলে। হঠাৎ কী যে হল তার—চঞ্চল হয়ে উঠল আর বজ্জাতি শুরু করে দিল। লিজা তো রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়ে গাড়ি থেকে মারল লাফ। লাফিয়ে পড়বার সময় গাড়ির চাকায় যে জড়িয়ে যায় নি কিংবা মাটিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে কোনো বড় রকমের আঘাত পায় নি লিজা—এই যা রক্ষে।

কিন্তু বিপদ ঐখানেই শেষ হল না। শুরু হল মাত্র। লিজা এ-সময়ে ছিল অন্তঃসত্ত্বা। বাড়ি ফিরেই অনুভব করল একটা অস্বাভাবিক বেদনার অস্বস্তি। 'পেন'টা বারে বারে আসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত রক্ষা হল না। গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হয়ে গেল। আর এ-ধাক্কা সামলে উঠতে অনেকদিন লাগল লিজার। বহু-প্রতীক্ষিত আসন্নপ্রায় একটি সৌভাগ্যের সূচনা অকালেই বিনষ্ট হল। প্রথম সন্তান সম্বন্ধে কত

www.BanglaBook.org

আশা-ভরসা ছিল ইউজিনের। সব ভূমিসাৎ। তার ওপর স্ত্রীর শয্যাগ্রহণ। মনস্তাপ আর ক্ষতির সঙ্গে যুক্ত হল বৈষয়িক গণ্ডগোল। সব যেন ওত পেতে বসেছিল, এই সময়টার জন্যেই। এক কথায় বলা যায়—ভণ্ডুল। আর সেই ভণ্ডুলের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করলেন শ্বশ্রূমাতা। লিজা বিছানা নেবার সঙ্গে সঙ্গেই তার মা এসে হাজির হলেন। জামাইয়ের বাড়িতে কায়েম হয়ে বসলেন বেশ কিছুদিনের জন্যে, মেয়েকে শুশ্রূষা এবং রোগের তত্ত্বাবধানের অজুহাতে।

এরপর মন আর ভালো থাকে কী করে? বিয়ের প্রথম বছরটা অন্তত মানুষ পায় ও চায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। ইউজিনের বরাত কী বিশ্রী চেহারা নিয়ে এসেই দাঁড়াল, একেবারে সামনে!

তবু—এ-সমস্ত অসুবিধা, হাঙ্গাম-হুজ্জৎ একটু একটু করে কাটিয়ে উঠল ইউজিন। বছরের শেষ দিকটায় যেন সুরাহা মনে হল। প্রথমত, ইউজিনের যেটা বহুদিনের আশা আর আকাঙ্ক্ষা—অর্থাৎ পিতামহের আমলের চালচলন নতুন যুগের উপযোগী করে ফিরিয়ে আনা, নষ্ট বিষয়-সম্পত্তির পুনরুদ্ধার করা—সেটা সাফল্যের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। অবিশ্যি খুবই ধীরে ধীরে, বাধাবিপত্তি কাটিয়ে হুঁশিয়ার হয়ে এগুতে হয়েছিল ইউজিনকে। তবু অবস্থার একটু উন্নতি হল। এখন আর ঋণশোধের জন্য সমস্ত তালুকটাকেই বিক্রি করার প্রশ্ন বা প্রয়োজন হল না। আসল দামি সম্পত্তিটা স্ত্রীর নামে লেখাপড়া করে দেওয়ার ফলে বেঁচে গেল। এবার, যদি বিট ফসলটা ভালোমতো ঘরে ওঠে, আর দামটাও চড়া থাকে, তাহলে আসছে বছরে এমন সময়ে, তার অভাব-কষ্ট কিছুই থাকবে না। অনটন দূর হবে; সংসার লক্ষ্মীশ্রীতে হবে পুষ্ট ও স্নিগ্ধ। এই গেল প্রথম কথা।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ইউজিনের স্ত্রীভাগ্য। স্ত্রীর কাছে যতই সে প্রত্যাশা করে থাকুক-না কেন, এখন তার কাছে সে যতটা পাচ্ছে তা কোনোদিনই সে কল্পনা করতে পারে নি। ভাবতে পারে নি ইউজিন, লিজা তাকে এতখানি পূর্ণ করে দেবে—ভরিয়ে রাখবে। লিজার কাছে যতখানি প্রত্যাশা ছিল মনে, বাস্তব জীবনে আর ব্যবহারে ইউজিন দেখতে পেল,—এ তার ঢের বেশি। কামনার অধীর আবেগ কিংবা উচ্ছ্বসিত, ব্যাকুল আগ্রহ—এগুলো তেমন হত না লিজার, যদিও ইউজিন চেষ্টা করেছিলে তাকে জাগাতে। আর হলেও, তা এত কম যে ঠিক বোঝা যেত না। কিন্তু অন্য একটা জিনিস পেল ইউজিন তার বদলে—যেটি সম্পূর্ণ নতুন জিনিস, অপ্রত্যাশিত—দৈহিক আবেদনের অনেক উর্ধ্বে। মানসিক তৃপ্তি। এখন মনে হয় ইউজিনের—জীবন যেন অনেকটা সরল, সহজ হয়ে এসেছে। মনটা তার সন্তোষে ভরে থাকে, অকারণ খুঁতখুঁতুনি আর ঘনিয়ে ওঠে না। বেশ খুশি-খুশি ভাবে, স্বচ্ছন্দ দেহ-মন নিয়ে সুস্থ জীবন যাপন আবার সম্ভব হয়। নির্বিরোধ জীবন-প্রীতি আর তৃপ্তির সুনিশ্চিত ছাপ পড়ে তার মুখে। ঠিক বুঝতে পারে না ইউজিন—এই পূর্ণতার ভাব কোথা থেকে এল, কেমন করে সম্ভব হল এই অনেক-পাওয়া হৃদয়ের ভরপুর সুখ! কিন্তু হয়েছিল তাই।

এটা সম্ভব হয়েছিল নানা কারণে! লিজার সরল, সহজ বুদ্ধি আর ছলনার লেশ-স্পর্শহীন নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার হল প্রধান কারণ।

ইউজিনের কাছে নিজেকে সে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিল, নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলেছিল আপনার স্বতন্ত্র সত্তা। বিয়ের ঠিক পরেই লিজার মনে হল—ইউজিন আতেনিভের মতোন জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, সাধু আর মহৎ লোক পৃথিবীতে নেই। এটা শুধু নব-পরিণীতার স্বাভাবিক প্রাথমিক উচ্ছ্বাস নয়। পুরুষের বক্ষোলগ্ন কুমারী-হৃদয়ের সঞ্চিত ভালোবাসার ব্যাকুল প্রকাশ নয়, সর্বস্ব-সমর্পণের গভীর আত্মতৃপ্তিও নয়। এটা হল বিচারসিদ্ধ মনোভাব, অন্তরের দৃঢ় ধারণা।

লিজার মনে ধারণা জন্মাল যে, ইউজিন যখন এত ভালো, এত উঁচু আর কর্তব্যপরায়ণ; তখন প্রত্যেকেরই কর্তব্য তাকে মেনে চলা, তার প্রভুত্বকে প্রসন্নচিত্তে স্বীকার করা। ইউজিনকে খুশি করা, তার মন জুগিয়ে চলা—এ-ছাড়া অন্য কিছু করণীয় নেই কারুর। কিন্তু আর পাঁচজনকে দিয়ে তাই করানো, তাদের বিশ্বাস জাগানো যখন সম্ভব নয়, তখন লিজাকেই একলা সে কাজ করতে হবে। যতদূর তার সামর্থ্য, তাই দিয়ে ইউজিনকে সে সন্তুষ্ট করবে। অক্ষুণ্ন রাখবে স্বামীর অভ্রান্ত কর্তৃত্ব—অধিকার।

www.BanglaBook.org

আর তাই করতে লাগল লিজা।

সমস্ত মন-প্রাণ যেন ঢেলে দিল ইউজিনের পেছনে,—তার সেবায় ও সন্তোষ-বিধানে। জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য দাঁড়াল স্বামীর অন্তরকে চেনা। লিজা তাই সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করল ইউজিনের হৃদয়কে নিজের হৃদয় দিয়ে বোঝবার জন্যে। ইউজিন কী চায়, কী সে ভালোবাসে, কখন কী তার পছন্দ—এই সমস্ত তথ্য আর খুঁটিনাটি আবিষ্কারে, আন্তরিকভাবে স্বামীকে প্রীত করবার চেষ্টায়, তার মন বুঝে সেইমতো চলবার আকুল আগ্রহে অধিকাংশ সময় কেটে যেত লিজার। এই নিত্য-নিয়ত অনুধ্যানে আর স্বামী-সেবার অনুবর্তনে সে কোনো কষ্টই গ্রাহ্য করত না। যত কঠিনই সে পরিশ্রম হোক, তাতে সে বিমুখ হবার পাত্রী নয়।

অনুরাগিণী স্ত্রীলোকের সংস্রব মানুষের মনে আনন্দই দিয়ে থাকে। কিন্তু ওরই মধ্যে যে-যে সদগুণ থাকলে তার সঙ্গসুখটা অতিমাত্রায় তৃপ্তিকর, কামনার বস্তু হয়ে ওঠে— সে সমস্ত সদগুণের মধ্যে যেটি বিশিষ্টতম, লিজার চরিত্রে তার অভাব ছিল না। স্বামীর প্রতি তার যে প্রগাঢ় ভালোবাসা, সেই নিছক ভালেবাসার জোরেই সে ইউজিনের মনের গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছিল। ইউজিন নিজেকে যতখানি না চিনত, লিজা তাকে চিনত তারও বেশি। বুঝতে শিখেছিল স্বামীর প্রতিটি মনোভাব, সযত্নে অনুধাবন করতে শিখেছিল তার প্রতিটি ভাবান্তর। মনের গোপন অন্তস্তলে,—যেখানে চলছে নিত্য সূক্ষ্ম কম্পন, পড়ছে কখনো হালকা কখনো গভীর আলো আর ছায়ার জটিল রেখা—সেইখানে, সত্তার নিভৃত মর্মমূলে নামত লিজার সন্ধানী দৃষ্টি। ধরা পড়ত ইউজিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-দুঃখ-নৈরাশ্যের পলাতক রেশগুলি। স্বামীর চিত্তের গোপন কোণগুলি পর্যন্ত উদভাসিত হয়ে উঠত স্ত্রীর সহানুভূতির সন্ধানী দৃষ্টির আলোয়। তাই ইউজিনকে কখনো কোনো আঘাত সে তো নিজ থেকে দেয়ই নি, বাইরের কোনো আঘাত আসবার সম্ভাবনাতেও সে ব্যাকুল হয়ে উঠত। আড়াল করে ঘিরে রাখত ইউজিনকে। নিজেকে সে চমৎকার খাপ খাইয়ে নিয়েছিল স্বামীর মানসিক অবস্থার সঙ্গে। স্বাভাবিক মমত্ববোধের দৃঢ় বনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত তার দাম্পত্য-প্রতিভা। সেই সহজ অথচ আশ্চর্য অভ্রান্ত বোধশক্তির সাহায্যেই লিজা নিয়ন্ত্রিত করে নিয়েছিল তার দিনানুদৈনিক জীবনের গার্হস্থ্য আচরণ এবং কর্তব্য।

তাই স্বামীর দুঃখ-দুশ্চিন্তা লাঘব করতে যেমনি তার ব্যগ্র চেষ্টা ; স্বামীর স্ফূর্তি-আনন্দে পূর্ণ অংশগ্রহণ করতে, সে আনন্দকে তীব্রতর করতেও তেমনি তার স্বাভাবিক নিপুণতা। এক কথায়, স্বামীর মন-বুঝে চলা মন-জুগিয়ে কাজ করার কঠিন কৌশলটি ভালোভাবেই লিজা আয়ত্ত করে নিয়েছিল। যে-সব ব্যাপার নিয়ে কোনো দিনই এযাবৎ সে মাথা ঘামায় নি,—যে-সমস্ত বিষয়ে তার বিন্দু-বিসর্গ জ্ঞান বা কৌতূহল ছিল না—সে-সব ব্যাপার নিয়ে কেমন অনায়াসে ইউজিনের সঙ্গে সে আলাপ করে আজকাল ! চাষ-বাস, ক্ষেত-খামার, কারখানার কাজ-কর্ম কিংবা জন-মানুষদের দিয়ে কাজ-করানো, খাটানো—এমনকি, মহালের লোকদের সম্বন্ধে মতামত দেওয়া—এসব বিষয় নিয়ে লিজা অবলীলাক্রমে ইউজিনের সঙ্গে আলোচনা করে। শুধু তাই নয়, কারখানা আর জমিজমা-সংক্রান্ত ব্যাপারে ইউজিনকে সব সময়েই সে সুপরামর্শ দিয়ে থাকে। আজকাল ইউজিনেরও হয়েছে এমনি যে, সর্বক্ষণ, সর্বকর্মে লিজাকে না হলে তার চলে না। লিজার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সরল সুচিন্তিত উপদেশ, সহজ বাস্তব বুদ্ধি ইউজিনের কাছে অপরিহার্য।

ইউজিনের কর্ম-জীবনে আর সাংসারিক জীবনে লিজার উপস্থিতি যে এতখানি অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে, তার প্রধান কারণ হল লিজা যাবতীয় বিষয় দেখতে আর বিচার করতে শিখেছিল ইউজিনের চোখ দিয়ে। উভয়ের দৃষ্টি আর মন অভিন্ন বলে জীবনে এসেছিল পূর্ণতা, নিরাবিল শান্তি।

লিজা তার মাকে খুবই ভালোবাসত। কিন্তু যেদিন থেকে সে বুঝল ইউজিন মনে-মনে তাঁর ওপর তেমন প্রীত নয়, বরঞ্চ উভয়ের পারিবারিক জীবনে অকারণ হস্তক্ষেপের জন্য রীতিমতো বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট, সেদিন থেকে লিজাও যেন বদলে গেল। কোনো-কিছু ব্যাপারে তর্কে অথবা মতামতে সে স্বামীর পক্ষ নিত। মধ্যে-মধ্যে স্বামীর হয়ে কথা বলতে গিয়ে এমন বাড়াবাড়ি করে ফেলত লিজা, যে ইউজিনকে লজ্জায় পড়তে হত তার দরুন। কোনোমতে সামলে নিত, পাছে

www.BanglaBook.org

কানো অপ্রিয় ব্যাপার ঘটে।

এ-ছাড়া লিজার চরিত্রে আর-একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তার কোনো কাজেই হঠকারিতা কিংবা অসংযমের পরিচয় পাওয়া যেত না। ঘরকন্নার কাজ থেকে বাইরের সমস্ত ব্যাপারেই একটা ভদ্র, মার্জিত রুচির ছাপ পাওয়া যেত। হঠাৎ কিছু করে বসা বা বলে বসা, কিংবা কাউকে অকারণে চটিয়ে দেওয়া অথবা তার মনে আঘাত দেওয়া—এগুলো লিজার ধাতে নেই। সংসার আর সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্কটা ছিল ধীর, স্থির, সাবধান ও সংযত। গা-জুরির চেয়ে বুদ্ধি-কৌশল যে কাজ দেয় বেশি,—এ সহজ সত্যটি লিজা ভালোভাবেই জানত। তাই অশান্তি-উৎপাতের ত্রিসীমানায় তাকে ঘেঁষতে হত না। নীরবে, নির্বিবাদে, পরিপূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে চলত নিত্যকার জীবন। চট করে কেউ বুঝতে পারত না, এর মধ্যে লিজার কৃতিত্বটা কোথায়। কিন্তু একটু নজর দিয়ে লক্ষ করলেই বোঝা যেত, লিজার সর্ববিধ কর্মে আর আচরণে ছিল পরিচ্ছন্নতা, ভব্যতা আর শৃঙ্খলা। অত্যন্ত সুপরিমিত সুনিয়ন্ত্রিত ছিল তার জীবন-যাত্রার ছন্দ। বিয়ের অল্পদিনের মধ্যেই লিজা বুঝে নিয়েছিল ইউজিনের জীবন-আদর্শের ধরনটা কী। তার অনুরাগ আর অপছন্দ জিনিসগুলো তলিয়ে বুঝে সে এমন একটা পারিবারিক জীবনের ছক তৈরি করে নিয়েছিল যাতে বিরোধের সম্ভাবনামাত্র না সৃষ্টি হয়। ঘরদোর সাজানো, গৃহস্থালির কাজ, সংসার চালানো আর সামাজিক মেলামেশা—সমস্ত ব্যাপারেই লিজা সেই ছকমাফিক নির্দিষ্ট পথে চলত। পথ যেখানে আগে থেকেই মসৃণভাবে প্রস্তুত, দ্বন্দ্বের অবসর কোথায় সেখানে? বিরোধের অবকাশ থাকলে তবে তো সংঘর্ষ! যেখানে মন বুঝে কাজ,—সুচিন্তিত আত্মসমর্পণে অখণ্ড প্রণতি, সেখানে উদ্ধত মতান্তর অথবা উদ্যত মনান্তর আসবে কী করে?

অবিশ্যি একটা মস্ত অভাব ছিল ওদের জীবনে। ছেলেপুলে কিছু হয় নি। কিন্তু হবার সময়ও পেরিয়ে যায় নি। অদূর ভবিষ্যতে আশা আছে তার।

সেবার শীতের গোড়াতেই লিজা গেল পিটার্সবুর্গে বড় ডাক্তার দেখাবার জন্যে। অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তিনি। বললেন, লিজার স্বাস্থ্যে তো কোনো খুঁত নেই। সন্তানাদি অনায়াসেই হতে পারে।

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল লিজার। বছর ঘুরতে না ঘুরতে লিজা বুঝল—সে অন্তঃসত্ত্বা।

সবই ভালো। কেবল একটা বড় গলদ। থেকে থেকে দুঃস্বপ্নের মতোন তার কালোছায়া জীবনের সমস্ত আলো যেন শুষে নেয়। লিজার মনে যখন হিংসার আগুন জ্বলে ওঠে, তখন জীবনের সব সুখ-শান্তি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। মনে হয়, বাঁচবার কোনো অর্থ হয় না। অবিশ্যি এই ঈর্ষাকে সে দমন করে চেপে রাখত, বাইরে প্রকাশ করত না কখনো। কিন্তু তীব্র অন্তর্দাহে, হিংসার চাপা আগুনে লিজা প্রায়ই কষ্ট পেত।

ইউজিন আর কাউকে ভালোবাসতে পারবে না, কারুর সম্বন্ধে সে চিন্তা করতে পারবে না— এই হল লিজার অন্তরের কথা। সে নিজে ইউজিনের যোগ্য কিনা—এই প্রশ্ন কোনো দিন তাকে চিন্তিত করে তোলে নি। কেননা, এসব ভাবনাকে লিজা আমল দিত না। কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোনো স্ত্রীলোক যে ইউজিনের যোগ্য নয়, সে-বিষয়ে তার কোনো সন্দেহই ছিল না। অতএব ইউজিনকে ভালোবাসবার মতোন স্পর্ধা ও দুঃসাহস যেন কারুর না হয়। পাছে তাকে কেউ ভালোবেসে ফেলে—সেই দুর্ভাবনায় লিজা সন্ত্রস্ত, বিভ্রান্ত হয়ে থাকত।

৮

এইভাবেই চলল তাদের জীবন। ভোরবেলায় উঠত ইউজিন, যেমন তার নিত্যকারের অভ্যাস। বিছানা ছেড়ে প্রত্যূষেই চলে যেত কারখানা কিম্বা গোলাবাড়ির দিকে। সেখানে তখন পুরোদমে কাজ চলেছে। তদারক করা দরকার। একমুহূর্ত সময়ও অপব্যয় করবার মানুষ নয় ইউজিন।

আন্দাজ দশটা বেলায় ইউজিন বাড়ি ফিরত শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে। প্রাতরাশ আর কফি নিয়ে এই সময়টা তারা বারান্দায় এসে বসত সবাই একসঙ্গে। মেরি পাভলোভনা, লিজা, ইউজিন নিজে আর

www.BanglaBook.org

একজন মামা। তিনি এই সংসারেই বাস করছেন কিছুদিন।

কফি খেতে-খেতে কথাবার্তা চলত—নানান বিষয় নিয়ে। কখনো কখনো তর্ক-আলোচনা বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠত। তারপর সবাই উঠে যেত যে-যার ঘরে আর নিজের কাজে। মধ্যাহ্নভোজনের সময় পর্যন্ত বাড়ি আবার নিস্তব্ধ। বেলা দুটো আন্দাজ, আবার সবাই খেতে আসত,—মিলত খাবার টেবিলে। খাওয়া আর গল্প-গুজব শেষ হলে ঘরে বড় একটা কেউ থাকত না। বেরিয়ে পড়ত বেড়াতে—কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো-বা গাড়ি করে।

সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরত ইউজিন। লিজা আর ইউজিন আরাম করে জমিয়ে তুলত চায়ের আসর। চায়ে চুমুক দিতে দিতে দু-জনে গল্প করত—এমনি কত কথা, সারাদিনের কাজের হিসেব, জমানো খবর...কখনো-বা ইউজিন কিছু একটা পড়ে শোনাত লিজাকে আর লিজা আরামকেদারায় হেলান দিয়ে চুপ করে শুনত, হাতে কোনো কাজ নিয়ে, সেলাই বা অমনি কিছু। তবে অতিথি-অভ্যাগত কেউ এলে ওরি মধ্যে একটু ব্যতিক্রম। স্রেফ গল্প-গুজব কিংবা সামাজিক আলাপ, লোক বুঝে। নয়তো একটু সঙ্গীতের আয়োজন—কারুর গান কিংবা পিয়ানো বাজনা।

কখনো কখনো ইউজিনকে বেরুতে হত কাজের উপলক্ষে। তখন বাইরে থেকে সে চিঠি লিখত লিজাকে। জবাবও মিলত নিত্য নিয়মিত, প্রতিদিন। এক-এক সময় লিজাও সঙ্গে যেত। তখন বেশ জমত। স্ফূর্তিতে আমোদে সময়টা যেন কোথা দিয়ে কেটে যেত।

বিশেষ কোনো উৎসবে—যেমন, উভয়ের জন্মদিনে কিম্বা নামকরণের দিনে, নিমন্ত্রণ করা হত পরিচিত লোকদের। অতিথির দল আসত, জমে উঠত ছোটখাটো পার্টি। ইউজিন বেশ তৃপ্তির সঙ্গে লক্ষ করত লিজার সামাজিক রূপের মাধুর্য। কেমন সুন্দর, সহজ তার চলাফেরা! পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর-দোর। যত্ন করে টেবিল পাতা, জিনিসপত্র যথাস্থানে রাখা। পরিপাটি করে সাজানো। কোথাও কোনো অগোছালো ভাব নেই। দেখে আন্তরিক খুশি হয় ইউজিন। অভ্যাগত অতিথিদের পরিচর্যায় লিজার ক্লান্তি নেই। সকলের স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে তার প্রখর নজর। কোথাও ত্রুটি হয় না,—কোন্‌খানে কী দরকার, কোথায় কোন্ অসুবিধা, কোন্‌টা কেমন মানানসই—সর্বত্রই লিজার স্নিগ্ধ দৃষ্টি, আতিথেয়তার কোমল প্রলেপ। ইউজিন শোনে আর দেখে—সকলেই লিজাকে পছন্দ করে। প্রীতিময়ী, অল্পবয়সী গৃহকর্ত্রীর শুভবুদ্ধির ওপরে সকলেরই আস্থা, অনুরাগভরা শ্রদ্ধা। ইউজিন দেখে। পরম তৃপ্তিতে হৃদয় যেন স্ফীত হয়ে ওঠে। লিজার প্রতি তার সহজ ভালোবাসাটা যেন আরো গাঢ়, আরো গভীর হয়ে ওঠে।

কাটছিল বেশ ভালোই। কোথাও কোনো গোলমাল নেই, আশঙ্কার কারণও নেই। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় লিজার স্বাস্থ্য বেশ ভালোই যাচ্ছিল। অসুস্থতার বা দুর্বলতার কোনো চিহ্ন দেখা যায় নি। গর্ভস্থ শিশুর ভার সে অনায়াসে, প্রফুল্লচিত্তেই বহন করছিল। প্রস্তুত হচ্ছিল প্রথম মাতৃত্বের আগামী শুভ দিনটির জন্যে। মনের কোণে হয়ত একটু আতঙ্কের ছায়া ছিল ঘনিয়ে। হয়ত একটু স্বাভাবিক দুশ্চিন্তা ছিল দু-জনেরই মনে—অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতার কাল্পনিক অনুমানে। কিন্তু জোর করে সরিয়ে দিত ইউজিন ওসব ভয় আর অস্বস্তি। লিজাকে নিয়ে বসত, গল্প করত, ভুলিয়ে দিত। কখনো আলোচনা করত অনাগত ক্ষুদ্র আগন্তুকের ভবিষ্যৎ নিয়ে, মতলব ফাঁদত নানা রকমের। কখনো-বা লিজার সঙ্গে কথাবার্তা চালাত শিশুকে কিভাবে মানুষ করা হবে, তাই নিয়ে। সন্তানের ভবিষ্যৎ, তার শিক্ষাদীক্ষাকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠত তাদের কল্পনার সৌধ।

কী ধরনের শিক্ষা দেওয়া হবে, কীভাবে তাকে গড়ে তুলতে হবে আর সে-সম্বন্ধে ব্যবস্থাই বা কী করা হবে—এসব ব্যাপারে শেষ সিদ্ধান্ত ইউজিনেরই হাতে—সে কথা বলা বাহুল্য। মনে মনে সে-ই সব ঠিক করে রেখেছে আর ইউজিনের মতামত লিজার পক্ষে চরম, শিরোধার্য। স্বামীর অভিমত আর ইচ্ছার বিপক্ষে কোনো মত বা ইচ্ছা প্রকাশ অথবা পোষণ করা যে সম্ভব, লিজার কল্পনাতেও তা আসে না। তার কাজ হল, সর্ববিষয়ে স্বামীর অনুগত হয়ে অনুকূল মত দেওয়া এবং সেই অনুসারে চলা।

www.BanglaBook.org

ইউজিন ইতিমধ্যে পুরোদমে ডাক্তারি বই পড়তে শুরু করেছে। চিকিৎসাশাস্ত্র আর শিশু-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সন্তানকে পালন আর গঠন করতে হবে—এই তার ধারণা ও প্রতিজ্ঞা। লিজা সব কথাতেই সায় দেয়, জেনে নেয় ইউজিনের বক্তব্য। আর প্রস্তুত হতে শুরু করে। আগাম তৈরি করে রাখে অজস্র ছোট ছোট জামা। ঠাণ্ডা আর গরম কাপড়ের টুকরো জমা হয়ে ওঠে। তৈরি হয় সুদৃশ্য দোলনা আর ছোট্ট নতুন গদির বিছানা। কোনোটা পাতবার জন্যে, কোনোটা বা শিশুকে শুইয়ে কোলে করে নিয়ে বেড়াবার জন্যে। ছোট্ট গদির সঙ্গে আবার ছোট্ট লেপ সেলাই করে জুড়ে দেওয়া—যেন নৌকার ওপর ছই। নরম খোলের মধ্যে কেমন আরামে শুয়ে থাকবে শিশু—আর দুলবে দোলনায়...

এইভাবে এগিয়ে এল বিয়ের দ্বিতীয় বছর—আর-একবার ঘুরে এল বসন্ত।

৯

ট্রিনিটি রবিবারের ঠিক আগেই সে ঘটনা।

লিজার তখন পাঁচ মাস চলছে। খুব সাবধানে থাকে। তবে শরীর তখনো অলস, মন্থর হয়ে আসে নি। সহজ স্বাভাবিকভাবেই কাজকর্ম করে, চলাফেলা করে—ঘুরে বেড়ায়। লিজার মা আর ইউজিনের মা—দু-জনেই আছেন বাড়িতে, লিজার শরীর আর স্বাস্থ্য তদারক করা দরকার। কিন্তু লিজার পিছনে সর্বক্ষণ নজর দেবার অছিলায়, তাকে সাবধানে রাখবার চেষ্টায় শুরু হয় দু-জনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। জমে ওঠে কর্তৃত্ব নিয়ে মন কষাকষি। পাল্লা দিয়ে উপদেশের ঠেলায় মাঝখান থেকে লিজার হয় প্রাণান্ত। ইউজিন এই সময়টা সমস্তক্ষণই অন্যমনস্ক। বীট-চারা জমিতে লাগিয়ে তাই নিয়ে নতুন পরীক্ষায় সে অহরহ ব্যস্ত। কেমন করে তাই থেকে বীট-চিনির কারবার ফলাও করে ফাঁদা যাবে, সেই চিন্তাতেই ইউজিন উন্মত্ত।

ট্রিনিটির ঠিক আগেই বাড়িটাকে ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে ফেলা দরকার, লিজা মনস্থ করলে। ঈস্টারের পর থেকে বাড়িতে আর হাত দেওয়া হয় নি। ঝুল-ময়লা-আবর্জনা জমে উঠেছে কোণে-কোণে। ধুয়ে-পাখলে আচ্ছা করে সাফ করা দরকার। দরকার আছে নিশ্চয়ই। তবে হাতে কাজ না থাকলে কিছু একটা করা আরো দরকার। আসবাবপত্র সরানো, খুঁজে খুঁজে ময়লা বের করে ঘরদোর ঝকঝকে পরিষ্কার করে তোলা মেয়েদের বাতিক।

লিজা ঠিক করলে—ঘরের চাকরদের দিয়ে শুধু হবে না। মেহনতের কাজ—অনেক সময় লেগে যাবে। তার চেয়ে বাইরে থেকে কয়েক দিনের জন্য জন-দুই ঠিকে মেয়েমানুষ আনা ভালো। দিনপিছু পয়সা পেলে মেয়েদের দ্বারাই এ-কাজ আরো ভালোভাবে উঠবে। কার্পেট ঝাড়া, আসবাব সরানো, ঝুল ঝাড়া, জানালা-দরজা, ঘরের মেঝে জল দিয়ে ধোয়ামোছা, বিছানা রোদ্দুরে দেওয়া, সাবান কাচা, চেয়ার-টেবিলের দাগ মুছে সাফ করা, ওয়াড় পরানো, পরদা ঝোলানো—অনেক কাজ। ঠিকে লোক নিতে হবে।

সকাল হতেই ঠিকে মানুষ এসে হাজির। তামার পাতে আগুন সাজিয়ে, উনুন ধরিয়ে তারা যথাসময়ে কাজ শুরু করে দিলে।

স্ত্রীলোক দু-জনের মধ্যে একজন হল স্টিপানিডা। কোলের শিশুকে সবে দুধ ছাড়িয়ে, কাজকর্মে বাইরে বেরুতে শুরু করেছে। জমিদারবাড়ির সরকার মশাইয়ের সঙ্গে সে এখন আছে। তারই সুপারিশে এই ঠিকে কাজ জুটেছে। অবস্থায় মন্দা পড়েছে। তাই জমিদারবাড়িতে ধোয়ামোছার ঠিকে কাজটি সে অনেক অনুনয়-বিনয় করে যোগাড় করে নিয়েছে।

ইচ্ছে ছিল—জমিদারের নতুন গিন্নিটিকে একবার ভালো করে দেখে নেয়। স্বামী তার এখনো বাইরে-বাইরে কাজ করে। স্টিপানিডা একলাই থাকে কোলের ছেলে নিয়ে। আগেকার মতোই এখনো সে স্ফূর্তিবাজ। সুবিধা-সুযোগ পেলে উড়ে বেড়ায় একটু-আধটু। চটুল স্বভাবটা তার যায় নি এখনো। প্রথমে সে ছিল বুড়ো দানিয়েলের সঙ্গে। বন থেকে জ্বালানি কাঠ চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় বুড়োর কাছে। ছাড়া পায় নি তার কবল থেকে। তারপর এল ইউজিন। মনিবের সঙ্গে বছরাবধি

www.BanglaBook.org

রইল। এখন আছে এই ছোকরা সরকারের সঙ্গে।

'এখন তো বাবুর বিয়ে হয়েছে, সুখ-সমাধা হয়েছে। নতুন বৌ এল ঘরে।' স্টিপানিডা ভাবে। ভারি সাধ হয় তার নতুন গিন্নিটিকে একবার দেখতে। কেমন লোক, ঘরকন্না কেমন করে, কে জানে! লোকে তো বলে—ভারি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মানুষ। নিখুঁত গেরস্থালি। ঘরদোর নাকি ফিটফাট সর্বক্ষণ—চমৎকার সাজানো!

ইউজিন স্টিপানিডাকে দেখে নি বহুদিন। রাস্তায় কোলে ছেলে নিয়ে যেদিন স্টিপানিডা গির্জে থেকে ফিরছিল শাশুড়ির সঙ্গে, সেইদিন তার সঙ্গে ইউজিনের শেষ চোখাচোখি। ইতিমধ্যে স্টিপানিডাও বড় একটা বেরুতে পায় নি। কাজের জন্য ইদানীং বাইরে যাওয়া সম্ভবও ছিল না তার পক্ষে। শিশুটি নিতান্তই বাচ্চা। তা ছাড়া, ইউজিন গ্রামের ভেতর দিয়ে তেমন যাতায়াত করত না পায়ে হেঁটে। তাই পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না বললেই হয়।

সেদিন শনিবার। ভোরবেলায়, পাঁচটার মধ্যেই উঠে পড়ল ইউজিন। গেল সেই পতিত জমিটার দিকে—যেখানে ফসফেট ছড়ানোর কথা। জমিটা অকেজো হয়ে পড়ে আছে কত দিন। ওটার উর্বরতা ফিরিয়ে আনতে হলে চাই সযত্ন চিকিৎসা আর শুশ্রূষা। ভোরবেলায় উঠে যখন ইউজিন বেরিয়ে যায়, তখনো স্ত্রীলোক দুটি কাজে লাগে নি। রান্নাঘর থেকে আগুন নিয়ে জল গরমের জন্যে স্টোভ ধরাচ্ছিল।

সকাল থেকে খেটেখুটে ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত হয়ে বাড়ি ফিরল ইউজিন। মনটা তার ভালোই আছে আজ,—বেশ একটা তাজা, স্ফূর্তির ভাব। দেহটাও পরিশ্রমে সতেজ আর টান হয়ে উঠেছে।

বাড়ির ফটকের সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামল ইউজিন। লাগাম ছেড়ে দিয়ে ঘোড়াকে জিম্মা করে দিল মালীর কাছে। উঁচু উঁচু ঘাসের ডগায় চাবুকটা নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এল ইউজিন। মুখে তার অস্ফুট কথার রেশ—'ফসফেটই ফলাবে'। একটু আগেই হয়ত কাউকে ও-কথা বলে থাকবে। তাই অন্যমনস্কতার ফাঁকে ফাঁকে ঐ কথার টুকরোটা মুখের আগায় ভাসছে। থেকে থেকে ঐ একই কথা মুদ্রাদোষের মতোন বেরিয়ে আসছে—'ফসফেটই ফলাবে!' কী ফলাবে—কোথায়—কখন—কার কাছে এসব না জেনে আর ভেবেই যেন কথাগুলো উচ্চারণ করছে ইউজিন। কী যেন আনমনা হয়ে ভাবছে সে—ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা উঁকি দিচ্ছে।

মেয়েরা তখন বাইরের উঠানে গালচেখানা এনে ধুলো ঝাড়ছে। অন্যান্য আসবাবও বাইরে আনা হয়েছে।

দূর থেকে এইসব দেখতে পেয়ে ইউজিন আপন মনেই বলে ওঠে, 'দ্যাখো, কী কাণ্ড! লিজার মাথায় কী যেন ঢুকেছে আজকে, সারা বাড়িখানা সাফ করে তবে ছাড়বে দেখছি···ফসফেটই ফলাবে···এ যেন হুলস্থুল ব্যাপার!···কী জবর গিন্নি···Mv, গিন্নি ঠাকরুনই বটে···'

মনে মনে কল্পনা করে নেয় লিজার পরিচিত মূর্তিখানি। কোমরে খাটো করে এপ্রন বাঁধা, ব্লাউজের হাতা গুটানো, হাতে হয়ত একটা লম্বা ঝাড়ন, আর মুখে সেই অনবদ্য হাসির দীপ্তি। যতবারই দেখে ইউজিন বাড়ি ফিরে এসে—লিজার সেই ঝকঝকে, শাদাসিধে পোশাক আর সৌম্য সহাস মুখ ঠিকই আছে। একটুও বদলায় না।

'বুট-জোড়াটা এইবার ছাড়তে হয়—যা গন্ধ বেরুচ্ছে! মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটবার সময়ে সার লেগে গেছে। গিন্নির আবার যা বর্তমান অবস্থা···গিন্নির কী অবস্থা? ও হোঃ—খুদে মনিব যে আসছে—বড় হচ্ছে ধীরে ধীরে···তাই'—ভাবতে ভাবতে হাসি ফুটে ওঠে ইউজিনের মুখে।

এগিয়ে যায় নিজের ঘরের দরজার দিকে। হাতলটায় হাত দেয়। আপন মনের খেয়ালে তখনো সে অন্যমনস্ক।

দরজাটা ঠেলে খোলবার আগেই, ভিতর থেকে সেটা আপনি খুলে গেল। দেখতে পেল সামনা-সামনি একটি স্ত্রীলোক কাঠের বালতিতে জল ভরে একহাতে ঝুলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে আসছে। শুধু পা, জামার আস্তিন গুটানো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাকে রাস্তা দেবার জন্যে সরে দাঁড়াল ইউজিন। মেয়েটিও একই সঙ্গে সরে দাঁড়াল, একপাশে ইউজিনকে পথ দেবার জন্যে। ভিজে হাতেই বুকের কাছটায় বড় রুমালখানা ঠিক করে নিলে।

'না না তুমি যাও···যদি দরকার থাকে, এখন আমি ঘরে নাই–ই ঢুকলুম'···বলতে বলতে সহসা থেমে যায় ইউজিন। ভালো করে চোখোচোখি হতেই চিনতে পারে···আর কথা বলতে পারে না।

হাসি–হাসি চোখে তাকায় স্টিপানিডা। ইউজিনের দিকে অপাঙ্গে কৌতুক দৃষ্টি হেনে স্টিপানিডা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। যাবার সময়ে স্কার্টের নিচের দিকটা ঠিক করে নামিয়ে দেয়।

'কী মুশকিল ! এ তো অসম্ভব ব্যাপার !'

ইউজিন আপন মনেই বলে ওঠে—উক্তিতে বিরক্তির ঝাঁজ ফুটে ওঠে।

ভ্রূকুঞ্চিত করে ইউজিন। অত্যাসন্ন আপদের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে যেন স্থৈর্যচ্যুতি ঘটে। হাতটা নাড়ে আর মুখের সামনে দোলাতে থাকে। যেন মুখের সামনে ভনভনে মাছির অহেতুক উপদ্রব···এক্ষুনি তাড়িয়ে দেওয়া দরকার।

মনটা বিরক্ত হয়ে ওঠে ইউজিনের। স্টিপানিডা যে এমন আকস্মিকভাবে তার দৃষ্টিপথের সামনে এসে সশরীরে হাজির হল—এইটেই হল গভীর অসন্তোষের কারণ। তাকে সে চোখ মেলে দেখল কেন? নিজেরই ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠে ইউজিন। যেমন অন্যমনস্কভাবে ঘরে ঢুকছিল, সেইরকম পাশ কাটিয়ে চলে গেলেই হত ! স্টিপানিডার দিকে নজর করবার কী কারণ ঘটেছিল !

ভারি বিশ্রী লাগে ব্যাপারটা। অকারণে মনটা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নিজের অন্যমনস্ক, নির্বোধ দুষ্কৃতির জন্যে। ওদিকে তাকাতে কে মাথার দিব্বি দিয়েছিল ?

তবু না তাকিয়ে পারে নি ইউজিন। উপায় ছিল না। দৃষ্টি গিয়ে নিবদ্ধ হয়েছিল স্টিপানিডার সতেজ, জীবন্ত শরীরটার ওপরে। কোমরের নিচেকার অংশটা ঈষৎ দুলে দুলে উঠছিল নৃত্যের স্বাভাবিক ছন্দে, কটিদেশ কম্পিত হচ্ছিল তার দৃঢ় অথচ লঘু পদক্ষেপে। ইউজিন চোখ সরিয়ে নিতে পারে নি, তাকাতে বাধ্য হয়েছিল তার সুঠাম বাহুর দিকে। তার সুডৌল কাঁধের শুভ্র কমনীয়তা, ব্লাউজের নরম পড়ন্ত ভাঁজগুলো, গাউনের আঁটসাঁট ছাঁদের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত দেহ–রেখার নম্র বঙ্কনী আর মাংসল পায়ের গোছের সুঠাম গড়নটুকু ইউজিনের চোখ দুটিকে যেন জাদুমন্ত্রে স্তব্ধ, আবদ্ধ করে রেখেছিল।

স্টিপানিডা পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। জোর করে চোখ নামিয়ে নেয় ইউজিন।

'কিন্তু ওর দিকে তাকিয়ে মরছি কেন?' ইউজিন নিজেকে ধিক্কার দিতে চেষ্টা করে। আর আপন মনেই বলে ওঠে : 'যাই, এবার বুট–জোড়াটা ছাড়ি গিয়ে···' তারপর নিজের ঘরের দিকেই এগিয়ে যায় ইউজিন।

কিন্তু পাঁচ–সাত পা যেতে–না–যেতেই হঠাৎ পিছন দিকে তাকিয়ে ফেলে ইউজিন। কিছু না ভেবেই, এমনি অকারণে—আর একবার দেখে নেয়। স্টিপানিডা তখন দালানের বাঁকের মুখে। হাসি–হাসি চোখে সে–ও ফিরে তাকায়।

'আহ্, কী যে করছি—কী যেন হয়েছে আমার ! হয়ত ভাববে—আবার···হয়ত কেন, নিশ্চয়ই ভাবছে এতক্ষণ !'

ঘরটা জল দিয়ে ধোয়া হয়েছে সবে। ভিজে আর স্যাঁতসেঁতে লাগছে। আরেকজন স্ত্রীলোক,—বৃদ্ধ আর শীর্ণ গোছের মেয়েমানুষ—তখন বড় মোটা লাঠি–বুরুশ দিয়ে ঘরের মেঝেটাকে জোরে জোরে ঘষছে, রগড়াচ্ছে। ময়লা জল তখনো এদিকে–ওদিকে ছড়িয়ে আছে। সন্তর্পণে পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে ইউজিন মেঝের ওপর দিয়ে হাঁটে, পাছে ছিটে লাগে। এগিয়ে গেল দেয়ালের কাছে, যেখানে বুট–জোড়াটা রাখা ছিল। জুতো নিয়ে ইউজিন ঘর থেকে বেরুবে, ঠিক সেই সময়ে বুড়ো মেয়েমানুষটি ঘর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। কীরকম একটা অস্বস্তি আর সন্দেহ উঠল ইউজিনের মনে। ওভাবে বেরিয়ে গেল কেন স্ত্রীলোকটি? কে যেন ভেতর থেকে বলে ওঠে নিশ্চিত অনুমান করে—'এই স্ত্রীলোকটি যখন গেল, তখন স্টিপানিডা বোধ হয় আসবে এবার। ঘরে ঢুকবে একলা···'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা গরম ঝাঁজ বয়ে যায় ইউজিনের সর্বাঙ্গে। চোখ মুখ কান সহসা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। 'কী সাংঘাতিক ! কী ছাই সব ভাবছি···আর কী করতে যাচ্ছি !'

বুট-জোড়াটা খপ করে তুলে নিয়ে একরকম ছুটেই বেরিয়ে যায় ইউজিন। ঘর থেকে দালানে গিয়ে দাঁড়ায়—পরে নেয় জুতো-জোড়াটা, কোনোরকমে টাল সামলে দাঁড়িয়ে। তারপর বুরুশ দিয়ে গায়ের কোটটা ঝেড়ে নিয়ে বারান্দার দিকে এগিয়ে যায়। দেখে দুই মা-ই হাজির সেখানে।

টেবিলের উপর কফির সরঞ্জাম। ইউজিনের দেরি হচ্ছে দেখে কফি খাওয়ার পালা শুরু হয়েছে।

লিজা বোধ হয় এতক্ষণ তারই প্রতীক্ষায় ছিল। ইউজিনকে আসতে দেখে অন্য দরজা দিয়ে ঠিক একই সময় ঘরে এসে ঢুকল এবার।

লিজার দিকে আড়চোখে তাকায় ইউজিন। ভাবে—'উহ্, কী কাণ্ড ! আর একটু হলেই—'

মনে-মনে বিভীষিকা দেখে যেন শিউরে ওঠে ইউজিন। আবার ভাবে : 'লিজা বিশ্বাস করে কত আমাকে ! জানে আমার স্বভাব পবিত্র, চরিত্র মহৎ—নির্দোষ···যদি সে জানত··· !'

লিজা মুখ তুলে চায় ইউজিনের দিকে। যেমন সে তাকায় নিত্যই, স্বামী যখন ঘরে ফেরে।

ইউজিনও তাকায়। দৃষ্টি তার প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে।

আজ ইউজিনের মনে হল—কেন তা সে জানে না—লিজা বড় দুর্বল অসহায়। আজ যেন লিজাকে বেশি নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে—কীরকম একটা পাণ্ডুর ছাপ তার মুখে—মুখখানা যেন আরো শীর্ণ, বেশি লম্বাটে হয়ে নেমে এসেছে চিবুকের কাছটায়···

১০

কফি খাওয়ার সময়ে কথাবার্তা হচ্ছিল—যেমন প্রায়ই হয়ে থাকে।

মেয়েলি কথাবার্তার ধরনটাই এই। কফি খাওয়াটা উপলক্ষ মাত্র। গালগল্পটাই আসল। কথা শুনে মনে হয়—প্রসঙ্গের চেয়ে পদ্ধতিটাই বুঝি বেশি দামি। কথাবার্তার মধ্যে কোনো যুক্তি বা পূর্বাপর সঙ্গতি থাকুক আর নাই থাকুক, অনেকক্ষণ ধরে সেটা চলে। বক্তব্যের মধ্যে সারবত্তার অভাবটুকু অধিকাংশ সময়েই পুষিয়ে নেওয়া হয় বাক্য আর শ্লেষের চাতুরী দিয়ে।

বারান্দায় কফি খাওয়ার টেবিলে যে-মেয়েলি আলাপ-আলোচনা চলছিল, সেটা বেশির ভাগই অসংলগ্ন। একজন বৃদ্ধা যদি একটা কথা তোলেন, অপরজন তার থেকে একটা ফ্যাঁকড়া বার করেন, চলে যান অন্যতর অবান্তর প্রসঙ্গে। কিন্তু কী আশ্চর্য ! কিছুক্ষণ পরে আবার পুরানো কথাতেই ফিরে আসেন নানা অর্থহীন মন্তব্যের মধ্য দিয়ে। চলে আবার কথা-কাটাকাটি।

এতক্ষণ দুই বেয়ানে তাই চালাচ্ছিলেন। দু-জনে দু-দিকে বসে পরস্পরকে ঠোক্কর দিচ্ছিলেন। সুবিধা ও সুযোগমতো একজন আর-একজনের গায়ে ছুঁচ ফোটাচ্ছিলেন।

ইউজিন যখন বারান্দায় এসে ঢুকল কফি খেতে, তখন তার মন উত্তেজিত, অবসন্ন। লিজা মাঝখানে পড়ে খুব কৌশলের সঙ্গে লগি ঠেলছিল। সরু খালে অজস্র ঘোলা জল আর দু-দিকে পাড়ের কাছে যথেষ্ট কাদা আর পাঁক। কোনোমতে, সঙ্কীর্ণ একটুখানি বাক্য-স্রোতের চাঁচে, লিজা দু-দিক বাঁচিয়ে কাউকে না চটিয়ে আর কাদা না ঘেঁটে, ঠেলছিল লগি-ফুটো নৌকোয় বসে প্রাণপণে, সন্তর্পণে।

ভারি বিরক্ত লাগল লিজার। দুই বুড়িতে কেন যে নিত্য-নিয়মিত অনর্থক কথা-কাটাকাটি করেন, দেখা হলেই শ্লেষবাণে পরস্পরকে জর্জরিত করতে থাকেন—বুঝে পায় না লিজা। মাঝখানে পড়ে দু-জনকেই খুশি রাখতে লিজার হয় প্রাণান্ত।

স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে লিজা আন্দাজ করে নেয় কিছুটা। অনুমান করে নেয় তার বিরক্তির কারণ। তাই নিজের বিরক্তিটা চাপা দিয়ে মুখে একটু হাসি টেনে বলে লিজা—'ভারি খারাপ লাগছে আমার। তুমি ফিরে এলে, অথচ তোমার ঘর এখনো সাফ হল না। তোমার ফেরবার আগেই ঘর মুছে পরিষ্কার করে রাখার কথা···'

সকলের দিকে চেয়ে, একটু থেমে আবার বলে : 'কিন্তু কী করব বল ? ধোয়ামোছা অনেক দিন

www.BanglaBook.org

হয় নি। ঘরদোরে এমনি জঞ্জাল জমেছে যে বলবার নয়···আগে থেকেই আমি বন্দোবস্ত করতে চাই···নইলে আর হবে না···'

ইউজিন বললে : 'যাক গে—তুমি ভালো ঘুমিয়েছিলে তো? আমি তো সেই কখন ভোরবেলায় উঠে চলে গেছি···

'হ্যাঁ—ঘুম ভালোই হয়েছিল। শরীর আমার ভালোই আছে।'

কথার মাঝখানে লিজার মা ফোড়ন দিলেন : 'শরীর ভালো থাকবে কী করে ওর? একে তো এই অবস্থা। তার ওপর গুমোট চলছে অসহ্য। আর জানলাগুলো তো সব পুবমুখো। ভোর হতে-না-হতেই রোদ এসে পড়ে। আর বেলা যত বাড়ে, রোদও চড়া হয়। ঘর তেতে আগুন।' একটু থেমে ভার্ভারা আলিক্সভনা বলে আবার, 'জানালায় তো আর পরদার বালাই নেই। আমার ঘরে কিন্তু ভিনিশিয়ন পরদা। দরকার হলে, মোটা কাপড়ের ঝাঁপ ঝুলানো হত যাতে সূর্যের তাত না ঢুকতে পারে···'

মেরি পাভলোভনা ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে জবাব দেন :

'কিন্তু দশটার পর থেকে তো রোদ্দুর সরে যায়! বাড়ি তখন ছায়ার মধ্যে পড়ে। আর আশপাশে বাগানের গাছ···'

'ঐজন্যেই তো আরো খারাপ। বাড়িটা অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। ছায়ার আওতায় থাকলে রোদ্দুর ঢুকবে কেমন করে? ভিজে, স্যাঁতসেঁতে ঘর···অসুখ-বিসুখ তো হবেই।' ভার্ভারা আলেক্সিভনা বলেই চলেন।

চড়া রোদ্দুরে বাড়ি গরম হয়ে ওঠে বলে নালিশ জানিয়ে পর মুহূর্তেই স্বাস্থ্যকর আলো আর হাওয়ার অভাবে বাড়িটা রীতিমতো খারাপ বলে নিন্দা করা, এ-দুটোর মধ্যে-যে কোনো পূর্বাপর সঙ্গতি নেই, ভার্ভারা আলেক্সিভনা সেই সহজ অযৌক্তিকতাটুকু নিজেই ধরতে পারেন না। আপন মনেই বলে যান অসংলগ্ন কথা—কেউ শুনুক আর না শুনুক—'আমাদের বাড়িতে কিন্তু অন্য নিয়ম। আমাদের যিনি দেখেন, তিনি মস্ত বড় ডাক্তার। তিনি কী বলেন জানেন? তাঁর মত হচ্ছে যে, রোগীকে ভালো করে না জানলে রোগ ধরা শক্ত। আগে রোগীকে ভালো করে চিনতে হবে, তবে তো রোগ নির্ণয় আর বিচার। মস্ত নামকরা ডাক্তার তিনি—তাঁর মতামত তো আর ফেলনা নয়। আমরা এইভাবেই তৈরি হয়েছি, জীবন কাটিয়েছি। ডাক্তারের মতামত অগ্রাহ্য করতে কখনো শিখি নি। আর কত বড় ডাক্তার···ফির টাকাও চাট্টিখানি নয়—শুনলে অবাক হয়ে যাবেন···আমাদের কাছে ভিজিট নেন একশো রুবল। তাও বিশেষ চেনাশুনা আর খাতিরের জন্যে। লিজার বাবা কিন্তু অন্যরকম মানুষ ছিলেন···উনি ডাক্তারিতে বিশ্বাস করতেন না। যত বড় ডাক্তারই হোক—ওদের ওপর কোনো আস্থা ছিল না তার। তবে আমার জন্যে টাকা ঢালতে কখনো কুণ্ঠিত হন নি।'

'যিনি ভালো লোক, তিনি তো হবেনই ঐরকম। যেখানে স্ত্রীর স্বাস্থ্য আর শিশুর জীবন নিয়ে টানাটানি, সেখানে কি টাকার খরচের প্রশ্ন ওঠে? ভবিষ্যৎ মঙ্গলের চিন্তায় তিনি তো ব্যস্ত হবেনই···'

মেরি পাভলোভনা বেয়ানের কথায় সায় দিয়ে এড়িয়ে যেতে চান।

ভার্ভারা আলেক্সিভনা মেরির নরম সুরে মনে-মনে একটু খুশি হয়ে ওঠেন। তবু দয়বার পাত্রী নন। বক্তব্যটা তাঁর এখনো শেষ হয় নি···তাই কথার সূত্রটা টেনে আবার বকতে শুরু করেন—'হ্যাঁ,···খুব ভালো মানুষ হলেই হয় না। হাত আর মন দরাজ হওয়া চাই। তবে, যে স্ত্রীর নিজের টাকার জোর আছে···অর্থ-সঙ্গতি আছে, তাকে আর স্বামীর ওপর তেমন নির্ভর করে থাকতে হয় না···'। ভার্ভারা আড়চোখে সবার দিকে তাকান। ওষ্ঠপ্রান্তে ক্ষীণ হাসির রেখা। গর্বের প্রসন্ন স্মিত হাসি। তারপর লিজার দিকে চেয়ে বলেন, 'আর কি জানেন—যে ভালো স্ত্রী, সে স্বামীর মতেই মত দিয়ে থাকে। আমার নিজের তাই শিক্ষা, আর লিজাকেও আমি সেই শিক্ষাই দিয়েছি। তবে এত কথা বলছি, মানে, লিজার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না বলে,···গেল বার অসুখের পর থেকেই ওর দেহটা দুর্বল হয়ে পড়েছে···'

'না, মা, আমার কিছুই হয় নি।' লিজা জোর দিয়ে বলে ওঠে। 'দিব্বি তো আছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি।

www.BanglaBook.org

খারাপ আবার দেখলে কোনখানটায়? যাকগে—কিন্তু তোমার তো দুধ-মালাই ফুটিয়ে দেওয়া হয় নি। দেখছি...'

'না ; আমার লাগবে না। কাঁচা দুধ আর ঠাণ্ডা ক্রিমেই চলবে...'

'লিজা, তোমার মাকে আমিও বলেছিলুম'...মেরি পাভলোভনা তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন একটু অপ্রস্তুতভাবে— 'বলেছিলুম, গরম দুধ-মালাইয়ের কথা। কিন্তু উনি তো নিতে চাইলেন না...'

'নাহ্, আজ আর কিছু দরকার নেই হাঙ্গামার।'

যেন একটা অপ্রীতিকর আলোচনা থামিয়ে দিতে চান, সেইরকম ভঙ্গিতে কথাটা শেষ করেন ভার্ভারা আলেক্সিভনা। কণ্ঠে তাঁর উদার ক্ষমাশীলতার কমনীয়তা। বেয়ান ঠাকরুনের কৈফিয়ৎটুকু যেন নিতান্তই অনাবশ্যক...বিজয়িনীর মতো গ্রীবা ঘুরিয়ে জামাইয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। জিজ্ঞাসা করেন, 'তারপর, ইউজিন, আজকের খবর বল দিকিনি। তোমার ক্ষেতে ফসফেট ছড়ান হল?'

লিজা দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল ক্রিম আনবার জন্যে।

'আমার কিন্তু আর ক্রিম চলবে না। সত্যিই আর দরকার নেই।'

ভার্ভারা আলেক্সিভনা চেঁচিয়ে বলেন। লিজা শুনেও শোনে না।

'লিজা, লিজা—আস্তে চল। অত ছুটে যেয়ো না...'

মেরি পাভলোভনাও বলে ওঠেন সঙ্গে সঙ্গে। তারপর বেয়ানের দিকে চেয়ে বলেন, 'এ-রকম অবস্থায় ওর জোরে-জোরে চলাফেরা কিংবা ছুটোছুটি করা মোটেই উচিত নয়। ওতে খারাপ হয়...হঠাৎ একটা কিছু গণ্ডগোল বেধে যেতে আর কতক্ষণ!'

'কিছুতেই কিছু হয় না' ভার্ভারা আলেক্সিভনা গম্ভীর কণ্ঠে রায় দেন। 'খারাপ কিছুতেই হয় না, যদি মনে শান্তি থাকে।' কথাটা এমন সুরে, এমন হেঁয়ালির ধাঁচে বললেন ভার্ভারা যে বাইরের যে-কোনো লোক সেখানে উপস্থিত থাকলে নিশ্চয়ই মনে করে বসত, একটা কিছু ব্যাপার আছে। মনের গোপনে অশান্তি সম্পর্কে একটা-কিছু তির্যক ইঙ্গিত করা হচ্ছে। অথচ ব্যাপারটা মোটেই ঘোরালো নয়। ভার্ভারা নিজেই ভালো করে জানেন যে, তাঁর মন্তব্য অকারণ এবং নিষ্প্রয়োজন। তাঁর উক্তির পিছনে কোনো সত্যই নেই। তবু ভারিক্কি চালে সবজান্তা সুরে কথা বলা তাঁর অভ্যাস। নইলে মতামতের গুরুত্ব এবং গাম্ভীর্য যায় কমে। সহজ কথার সঙ্গে অবাস্তব কথা জড়িয়ে, ঘুরিয়ে, ফেনিয়ে বলাটাই তাঁর মতে বিজ্ঞতা ও মর্যাদার পরিচয়।

লিজা ফিরে এল ক্রিম নিয়ে। ইউজিন কফি খাওয়া শেষ করে বসে রইল মুখ গোমড়া করে। মেজাজ তার অপ্রসন্ন। এ-রকম বৃদ্ধার বাঁকা-বাঁকা কথা আর শ্লেষ-নিপুণ অন্তর-টিপুনিতে সে অবিশ্যি অভ্যস্ত। কিন্তু আজ বড় বিশ্রী লাগছে ইউজিনের। মাথা নেই, মুণ্ডু নেই—খালি বজরবজর! এত বাজে কথাও মানুষ অকারণে বকতে পারে! কী যে লাভ হয় ওদের, ঈশ্বর জানেন!

ইউজিন চাইছিল একটু চুপচাপ। চাইছিল স্তব্ধতা, শান্তি। খুঁজছিল আপন মনে নির্জন চিন্তার একটুখানি অবসর। মনটা আজ বিক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছে। ঘর-ধোয়া ব্যাপার নিয়ে এইমাত্র যা ঘটে গেল, স্টিপানিডার প্রসঙ্গে যে-সব চিন্তা মাথায় এসে বাসা বেঁধেছে,—তার ফলাফলটা কী, ব্যাপারটা কত দূর গড়াতে পারে—এইসব ভাবনাই এখন তার মন জুড়ে রয়েছে। তাই দুই বেয়ানের সেয়ানা বোকামি তার অসহ্য লাগছে। নিভৃত চিন্তাস্রোতে রীতিমতো বাধা পড়ছে।

কফি খাওয়া শেষ করে ভার্ভারা আলেক্সিভনা উঠে গেলেন বারান্দা থেকে। মুখখানা ভারি-ভারি। বসে রইলেন মেরি পাভলোভনা আর ইউজিন ও লিজা।

পরস্পর একটু মুখ চাওয়াচাওয়ি হল মাত্র। তারপর আবার কথাবার্তা শুরু হল। বেশ সহজ, সরল কথাবার্তা...। কথাবার্তা চলল বটে কিন্তু জমল না। লিজার মনটা সূক্ষ্ম, দৃষ্টিও তীক্ষ্ণ। তাই চট করে বুঝে নিলে, স্বামীর কোথায় কী যেন হয়েছে। কোনো একটা চিন্তা ইউজিনের মনকে পেয়ে বসেছে, ক্লিষ্ট করে তুলেছে। স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করল লিজা, 'কী হয়েছে তোমার, বল তো? কোনো

www.BanglaBook.org

খারাপ খবর পেয়েছ নাকি?'

লিজার আকস্মিক প্রশ্নে একটু বিচলিত বোধ করে ইউজিন। এর জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। একটু সামলে নিয়ে জবাব দেয়, 'নাহ্, কিছু হয় নি তো।'

প্রত্যুত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারল না লিজা। মাঝখান থেকে তার নিজেরই দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে গেল। ইউজিনের যে কিছু হয়েছে এবং বেশকিছু হয়েছে, সে বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ নেই। ইউজিনের চোখে-মুখে একটা ক্লেশকর ভাবনার ছাপ এতই সুস্পষ্ট যে, ভুল করবার কারণ থাকতে পারে না। কী সেই ব্যাপার—যার চিন্তায় সে এতক্ষণ মগ্ন? যে-চিন্তার উত্তাপে ইউজিনের মুখখানা ঈষৎ আরক্ত, ললাট কুঞ্চিত আর ভ্রূ-কুটিল দৃষ্টি? উত্তেজনার নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে, স্পষ্টই বুঝতে পারে লিজা, যেমন পরিষ্কার বোঝা যায় দুধে মাছি পড়েছে। কিন্তু ইউজিন সেটা এড়িয়ে যেতে চায়, চাপতে চায়...কী এমন গোপনীয় ব্যাপার—যেটা কষ্ট দেয়, দুশ্চিন্তায় ফেলে; সহজ ও সুস্থ মানুষকে বিব্রত, এমনকি উৎপীড়িত করে তোলে, অথচ মুখ ফুটে বলবার নয়...?

লিজা ঘটা করে ভাবতে বসে। কড়া নজর রাখে ইউজিনের মুখের ওপর। সূক্ষ্ম সংবেদনায় আর গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে যেন ইউজিনের ভাবান্তরের প্রকৃত তাৎপর্য ধরে ফেলবে সে।

দুপুরের খাওয়া শেষ হলে যে-যার ঘরে চলে গেল।

এই সময়টা বিশ্রামের। সকলেরই অবসর। হাতে কোনো কাজ থাকে না। ইউজিন চলে গেল তার পড়বার ঘরে, যেমন সে গিয়ে থাকে প্রত্যেক দিন, দুপুরবেলায়।

অন্যদিন লাইব্রেরি থেকে এক-আধখানা বই টেনে নাড়ে-চাড়ে ইউজিন। আজ আর কিছু ভালো লাগছে না তার। বইও খুলল না, চিঠিপত্র যা থাকে লেখবার এই সময়টা তা-ও লিখল না। খালি বসে রইল চুপচাপ। একটার পর একটা সিগারেট ধরায়, অন্যমনস্কভাবে খেয়ে যায়। আর ভাবে। সে ভাবনার যেন অন্ত নেই।

বিয়ে হয়ে যাবার পর থেকে ইউজিনের ধারণা জন্মেছিল যে, মন তার কু-ভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। অন্য স্ত্রীলোক-ঘটিত কোনো চিন্তাই তার মনে আর-ছায়াপাত করতে পারবে না। নিজে থেকে প্রশ্রয় দেওয়া তো দূরের কথা।

কিন্তু আজ এ কী হল? কামনার দুষ্টক্ষত তাহলে কি এতদিন চাপা পড়ে ছিল? সুবিধা-সুযোগ বুঝে আবার আত্মপ্রকাশ করেছে। যে-অস্বস্তিকর ব্যাপার তার জীবন থেকে ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বলে সে ইতিমধ্যে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিল, সেই ব্যাপারের অপ্রত্যাশিত পুনরাবির্ভাবে ইউজিন রীতিমতো সন্ত্রস্ত, আতঙ্কিত হয়ে উঠল।

বিয়ের পর থেকে এ ভাবটা এতদিন তার হয় নি। অবদমিত ক্ষুধার অছিলা ছিল না কিছুই। নিজের স্ত্রীর ছাড়া এ ধরনের দেহাসক্তি বা যৌন-আকর্ষণ ইউজিনকে টানতে পারে নি। না স্টিপানিডা—যে-স্ত্রীলোকের সঙ্গে প্রাগ-বিবাহিত জীবনে ঘটেছিল একটা অবৈধ মিলন, না অন্য কোনো তৃতীয় রমণী। বিয়ের আগে দেহের যে-চাঞ্চল্য, মনের গভীর অপ্রসাদ থেকে থেকে-থেকে নাড়া দিয়ে যেত, লিজাকে কাছে পাওয়ার পর থেকে সে ধরনের মনোভাব ইউজিনকে আর পীড়িত করে নি।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল ইউজিন। ভেবেছিল—এতদিনে তার মুক্তি হল। দেহানুরক্তির প্রচণ্ড জাদুমন্ত্র কেটে গিয়েছে ভেবে তার আনন্দের সীমা ছিল না।

কিন্তু আজ? হঠাৎ এই যে দেখা হয়ে গেল দু-জনের, ঘটনার ফেরে, হয়ত এর কোনো অর্থ নেই, পিছনে নেই সুবিদিত পরিকল্পনা। নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার উভয়ের এই আকস্মিক সাক্ষাৎ। আপাতদৃষ্টিতে এটা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ত নয়, অন্তত গুরুত্ব আরোপ করা চলে না। তবু....তবু ইউজিন বুঝতে পারল, তাকে বুঝতে হল স্থির মুহূর্তে আত্মবিশ্লেষণ করে—সে আজও মুক্ত নয়। দেহ-আবেদনের ঊর্ধ্বে সে উঠতে পারে নি।

মন তার পীড়িত, দুশ্চিন্তায় খিন্ন। কিন্তু ইউজিনের মানসিক অবসাদের কারণটা হল অন্য।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্টিপানিডাকে সে-যে আবার কাছে পেতে চায়, উপভোগ করতে চায় তার চির-নবীন দেহ-সৌন্দর্যকে অথবা হালকা মানসিক দুর্বলতার কাছে ইউজিন পরাজয় স্বীকার করে নিজেকে ছেড়ে দিতে চায়—এই চিন্তাটাই তার মন-খারাপের প্রকৃত কারণ নয়। কেননা, স্টিপানিডাকে আবার অঙ্কশায়িনী করে নেওয়া সে কল্পনাতেও আনতে পারে না। ভাবতেই পারে না, কেমন করে সে আবার নিজেকে নিজের কাছে এতখানি খেলো করে ফেলবে।

ইউজিনের দুশ্চিন্তার কারণটা হল স্বতন্ত্র। তার অবসাদ আসছে সূক্ষ্ম ও নির্মম বিচার-বুদ্ধি থেকে।

মনের গোপন গহনে যে কু-ভাবটা এখনো টিকে রয়েছে, এইটেই হল তার আসল উদ্বেগ। অবচেতন সত্তায় প্রাথমিক জৈব প্রবৃত্তি সুপ্ত হয়ে থাকলে এখও যে বলবৎ আছে—এইখানেই ইউজিনের আতঙ্ক ঘনিয়ে ওঠে। সাবধানে থাকতে হবে তাকে, অত্যন্ত সন্তর্পণে—যেন অতর্কিত আক্রমণে তাকে কাবু করে না ফেলে...কড়া লাগামে টেনে রাখা দরকার।

চেষ্টা করলে, মনের জোর থাকলে ও-ভাবটাকে দমন করে ফেলা এমন কী শক্ত কাজ? ইউজিন ভাবে। দমন করতেই হবে, যে-কোনো উপায়ে...অঙ্কুর অবস্থায় বীজসুদ্ধ উন্মূলিত করা চাই। আর তা করবার মতো মনের দৃঢ়তা এবং আত্মপ্রত্যয় আছে ইউজিনের, সে কথা সে জানে। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কোনো দ্বিধা নেই তার মনে।

বসে বসে সিগারেট টানে আর ভাবে ইউজিন। মনের জোর যেন জোয়ার বইয়ে দেয়। খুশিতে গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে, উঠে পায়চারি শুরু করে।

পোড়া সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে টেবিলের কাছে এগিয়ে আসে ইউজিন। ওহো, কাজ তো এখনো বাকি! এতক্ষণ অন্যমনস্ক চিন্তায় খানিকটা সময় নষ্ট হয়ে গেল। একখানা চিঠির জবাব দেওয়া হচ্ছে না বহুদিন, সেটা লিখে ফেলতে হয় এই বেলা। আর, একখানা কাগজে দলিলের একটা খসড়া তৈরি করতে হবে। দেরি করে লাভ নেই। চেয়ারটা টেনে নিয়ে লেখবার টেবিলে ইউজিন ঝুঁকে পড়ে বসে, শুরু করে দেয় কাজ।

লিখতে লিখতে আর কাজ করতে করতে মনের চাঞ্চল্য আর দুশ্চিন্তার কথা ভুলেই যায় ইউজিন! লেখা শেষ করে টেবিল থেকে সে উঠে পড়ল। তারপর চলল আস্তাবলের দিকে। ঘোড়াগুলোকে সে একবার নিজে দেখে রোজই, এই সময়ে।

আর কী আশ্চর্য—যেন দৈবের চক্রান্ত! ঘটনাগুলো যেন আগে থাকতে সব সাজানো থাকে। তারপর যোগাযোগ হয়ে যায়, একত্র এসে জড়ো হয়। কেমন বেমালুম মিলে গিয়ে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে! সন্দেহ হয় যেন যোগসাজশ।

ইউজিন ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় পড়ল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেই গাড়ি-বারান্দা পেরিয়েছে, অমনি কোথা থেকে কী যেন একটা ঘটে গেল। দুর্ভাগ্য ইউজিনের যেন ওত পেতে বসে ছিল। বাঁ দিক দিয়ে দেয়ালের বাঁক থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল লাল রঙের স্কার্ট আর লাল রঙের রেশমি রুমালখানা। আকস্মিক দৈব ঘটনাই হোক, আর ইচ্ছে করে চোখের সামনে এসে দাঁড়ানোই হোক, ব্যাপারটা ঘটে গেল এক লহমায়। তলিয়ে দেখবার অবকাশ হল না। চলে গেল সামনে দিয়ে ইউজিনের, হনহনিয়ে। তাড়াতাড়ি যাবার চেষ্টায় হাত দু-খানা দুলছে। সর্বাঙ্গে কেমন একটা দোলন-নাচের ভঙ্গি। শুধু সামনে দিয়ে চলেই গেল না, দেখিয়ে গেল বেশ একটু ভঙ্গিমা। ডান দিকে কয়েক পা গিয়ে, হঠাৎ ছুটতে লাগল আস্তে আস্তে—সামনে যে-পরিচারিকাটি যাচ্ছিল, তাকে ধরবার জন্যে। দেখল, যেন কর্মব্যস্ত ভাবখানা। কিন্তু ওরি মধ্যে বেশ রঙ্গ-ভরা সঙ্কোচ। ছলনাময়ীর অবলীলা।

আবার ভেসে উঠল চোখের সামনে পুরানো দিনের সেই অবিস্মরণীয় ছবি। একটি হলদে দুপুর...বুড়ো দানিয়েলের ছোট্ট কুঁড়েঘরখানার পিছনে ঢেউখেলানো পোড়ো-জমির খোন্দল....অদূরে কাঁটাবন...আশেপাশে দু-চারটে প্লেন গাছ...ছায়ায় ঘেরা একটুখানি পরিষ্কার নিভৃত জায়গা।...আর সেইখানে, পরিচিত পোশাকে, উজ্জ্বল হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে

www.BanglaBook.org

স্টিপানিডা...মুখে কী যেন একটা পাতা চিবুচ্ছে।

কল্পনায়, মানসচক্ষে ছবিটা আশ্চর্যরকমের স্পষ্ট আর জীবন্ত হয়ে যেন এগিয়ে আসে ইউজিনের বুকের কাছে। যেন নিশ্বাস আর বুকের স্পন্দন শোনা যায়। মুখে-চোখে হাসির ঝিলিক আর ধবধবে শাদা দাঁতের পুরন্ত ঠোঁটের টানটোনগুলো কী এক ইন্দ্রিয়জ উন্মাদনা যে জাগায়, তা বলবার নয়। দেহটা ইউজিনের যেন শিরশিরিয়ে ওঠে। হাত মুঠো করে, শরীরটাকে টান করে শক্ত হয়ে খানিক দাঁড়ায় ইউজিন। তারপর আপন মনেই বলে ওঠে : 'নাহ্, অসম্ভব। এভাবে আর গড়াতে দেওয়া উচিত নয়...'

স্ত্রীলোক দু-জন প্রাচীরের আড়ালে চলে গেল। একটুখানি অপেক্ষা করে ইউজিন সোজা চলল কাছারি-বাড়ির দিকে। মন তার কঠিন।

দুপুরবেলায় খাওয়ার জন্যে থাকে নির্দিষ্ট খানিকটা সময়। এখন বিশ্রামের ঘণ্টা। এ-সময়ে সরকার মশাইকে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই, মনে মনে আশা করে ইউজিন।

পাওয়াও গেল। দুপুরবেলার খাওয়া সেরে মাধ্যাহ্নিক তন্দ্রাটুকু উপভোগ করে সবে উঠেছেন সরকার মশাই। আড়মোড়া ভেঙে আর গোটা কয়েক হাই তুলে দেহের জড়তাটুকু কাটিয়ে নিচ্ছেন। একজন চাষি হাত-পা নেড়ে অনেক কথাই বোঝাচ্ছে তাঁকে। সরকার মশাই অলসভাবে কথাগুলো আধ-বোজা চোখে শুনছেন বলে মনে হল।

'ভ্যাসিলি নিকোলাইচ...।' ইউজিন একটু উচ্চকণ্ঠেই হাঁক দিলে।

শশব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এলেন সরকার মশাই। বল্লেন, 'আমায় ডাকছেন, হুজুর?'

'হ্যাঁ, দরকার আছে একটু আপনার সঙ্গে...'

'বলুন, হুজুর...'

'আপনার কাজ সেরে নিন আগে...কী যেন বলছিলেন ওকে...?'

চাষির দিকে ফিরে তাকালেন সরকার মশাই।

বললেন, 'ওটাকে তুলে নিয়ে আয় না মাঠ থেকে...'

'বড্ড ভারী যে বাবু...' চাষিটা বলে সরকার মশাইকে।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞাসা করে ইউজিন।

'কিছু না—একটা গাইয়ের বাচ্চা হয়ে পড়েছে মাঠের মধ্যে, হুজুর। এখুনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি...ঘোড়া জুতে মাল-টানা গাড়িখানা পাঠিয়ে দিচ্ছি...গাই আর বাছুরটাকে তুলে নিয়ে আসুক। ওরে কে আছিস? নিকোলাচ লাইসুখকে বলে দে না, গাড়িটা বার করুক...'

চাষিটা নিজেই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল কাছারি-বাড়ি থেকে, খবরটা পৌঁছে দিতে। সরকার মশাইয়ের হুকুম...খোদ মনিব স্বয়ং দাঁড়িয়ে কাছারি-ঘরে। ব্যাপারটা ভীষণ জরুরি।

'আপনি জানেন কিনা জানি না, সরকার মশাই...' কথাটা উত্থাপন করতে গিয়েই ইউজিন লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে। বুঝতে পারে নিজের সঙ্কোচ। তবু জড়তা কাটিয়ে জোর করেই বলে...'হয়ত আপনি শুনে থাকবেন, ভ্যাসিলি নিকোলাইচ, যে আমি—বিয়ের আগে একটু উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছিলুম। মানে ঠিক সোজা পথে থাকতে পারি নি...'

হাসি-হাসি চোখে তাকিয়ে থাকে ভ্যাসিলি নিকোলাইচ। এমন ভালো মনিবের জন্যে একটু দুঃখ বোধ না করে পারে না। বলে, 'আপনি কি স্টিপানিডার কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ...তা দেখুন, ওকে বাড়ির ঠিকে-কাজে নিযুক্ত করাটা ঠিক উচিত হয় নি, নয় কি? মানে, বাড়ির মধ্যে ও হামেশাই যাতায়াত করছে...আমার পক্ষে সেটা একটু বিশেষ সঙ্কোচের কারণ, ভারি বিশ্রী লাগছে ব্যাপারটা—'

'আমার মনে হয় ছোট নায়েব ভানিয়াই ওকে ব্যবস্থা করে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে...'

'হ্যাঁ...একটু দেখবেন তাহলে...আর—'

নিজের সঙ্কোচ ঢাকবার জন্যে ইউজিন কথাটা তাড়াতাড়ি উলটে দিয়ে বলে, 'আর বাকি ফসফেটগুলো এইবার জমিতে ছড়িয়ে দিলে হয় না...কি বলেন?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এখনি যাচ্ছি ক্ষেতে, গিয়ে বন্দোবস্ত করছি...আপনি নিশ্চন্ত থাকুন...।' কথাটা শেষ হল এখানেই।

ইউজিনের উত্তেজনা এইবার কমে যায়। শান্ত হয়ে আসে মন। ইউজিন ভাবে, বছরাবধিকাল যদি কেটে গিয়ে থাকে স্টিপানিডার অদর্শনে, তাহলে বাকিটাও কাটবে। ও চলে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে নিশ্চয়ই।

'তা ছাড়া' ইউজিন মনে মনে বিচার করে, 'ভ্যাসিলি নিকোলাইচ ছোট্ট নায়েব আইভানকে এ-সম্বন্ধে নিশ্চয়ই বলবে। আইভান তখন স্টিপানিডাকে ডেকে বলবেই। তাহলেই ও বুঝবে যে, আমি চাই না...দেখা-সাক্ষাৎ তখন বন্ধ হয়ে যাবে। মানে সম্ভবই হবে না...'

ভেবে খুশি হয় ইউজিন। জোর করে লজ্জার মাথা খেয়ে সরকার মশাইয়ের কাছে গিয়ে সে-যে অনুরোধ জানাতে পেরেছে, তাতে সে আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। ভ্যাসিলি নিকোলাইচ-এর সামনে এই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উত্থাপন করাটা খুব সহজ হয় নি। কিন্তু সমস্ত সঙ্কোচ কাটিয়ে তাকে বলে আসা সত্যিই মনের দৃঢ়তার পরিচয়। ইউজিন সেটা পেরেছে। আবার পিছলে পড়ার আগেই সে সাবধান হয়েছে। আর ওসব কিছু হতে দেবে না সে। গোড়া মেরে ব্যবস্থা করে এসেছে, ভ্যাসিলি নিকোলাইচ-এর কাছে—যাতে স্টিপানিডা এ-বাড়িতে আর না ঢোকে।

'ভালোই হল' ইউজিন ভাবে, 'অনেক ভালো। ও-রকম ধোঁকার চেয়ে এ-হাজার গুণে ভালো হল। মনের মধ্যে দুনিয়ার লজ্জা, সঙ্কোচ, দ্বিধা আর সন্দেহ নিয়ে বাস করার চাইতে নিজের হাতে কাটান-ছেঁড়ান করে দেওয়াই ভালো। একমুহূর্তের সঙ্কোচ জয় করে চিরজীবনের পরিতাপ দূর করা ভালো নয় কি? নিশ্চয়ই ভালো...' ইউজিন শান্ত হয়ে আসে। উদ্বেগ কেটে গিয়ে মন আত্মপ্রসাদে পূর্ণ হয়, আর অতীত পাপস্মৃতির চিন্তাতেও গা-টা যেন শিউরে ওঠে।

এইভাবে আরও কিছুদূর গড়াতে দিলে ব্যাপারটা কীরকম ঘোরালো হয়ে উঠত? পথটা কি পিছল হয়ে উঠত না? মনে মনে কল্পনা করে ইউজিন। অদূর ভবিষ্যতে অধঃপতনের নিশ্চিত সম্ভাবনার স্মৃতি যেন সারা গায়ে শিউরানি লাগিয়ে দেয়। বড় জোর বেঁচে গেল ইউজিন এ-যাত্রা।

ভ্যাসিলি নিকোলাইচ-এর সঙ্গে এইসব কথাবার্তা বলার ফলে ইউজিনের মন এক হিসেবে অনেকটা শান্ত হয়ে এল।

অপর কোনো ব্যক্তির সামনে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের উল্লেখ রীতিমতো অবাঞ্ছনীয় প্রসঙ্গ। কিন্তু সেই নিতান্ত স্বাভাবিক লজ্জা-সঙ্কোচ কাটিয়ে, অথচ গাম্ভীর্য অবলম্বন করে সরকার মশাইয়ের কাছে স্টিপানিডার কথাটা যে তুলতে হল, সেটা একান্তই নিরুপায় হয়ে। মনের জোর এনে কাজটা করতে হল ইউজিনকে। আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কিছুটা আত্মপ্রকাশ না করে উপায় ছিল না। কিন্তু ফল তাতে ভালোই হল। মনের মধ্যে অহরহ যে অস্বস্তি আর অশান্তি খচখচ করছিল কাঁটার মতোন, কিছুদিনের জন্য অন্তত সেটা দূর হল। এত বড় একটা অপ্রীতিকর ব্যাপারের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে হলে একটা কিছু হেস্তনেস্ত করা দরকার।

ইউজিন মনে-মনে ভাবল—'যা হোক, ব্যাপারটা এইখানেই শেষ!'

ইউজিনের মুখের দিকে তাকিয়ে লিজা চট করে বুঝে নেয় ইউজিন এখন বেশ শান্ত হয়ে এসেছে, মানসিক উত্তেজনা তার দূর হয়েছে। এমনকি, একটু ভালো করে নজর করলেই ধরা যায় যে, ইউজিনের মনে আজকাল যেন আরো খুশি-খুশি ভাব। লিজা ভাবে, আমাদের মায়েদের এই নিত্য কথা কাটাকাটি আর হুল-ফোটানোর জ্বালায় ইউজিন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। আর সত্যি! কান ঝালাপালা হয়ে যায় ওদের তর্ক আর শ্লেষ শুনতে শুনতে। কবে আর ভালো লাগে এই সব নীচতা! যে নিজের কাজে সর্বদাই ব্যস্ত, কারুর সাতে-পাঁচে থাকা ভালোবাসে না, যার অন্তঃকরণ পবিত্র আর উদার, তার পক্ষে এইসব মেয়েলি ঝগড়া, ভব্যতাহীন দোষারোপ আর অকারণ বক্রোক্তি সহ্য করা কঠিন।

পরের দিন হল ট্রিনিটি রবিবার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আকাশ ঝকঝকে, বাতাসও পরিষ্কার। কোথাও এতটুকু মেঘের মালিন্য নেই। গ্রামের মেয়েরা, বেশিরভাগ চাষির ঘরের বৌ-ঝিরা, দলে দলে বেরিয়েছে বনের পথে। ফুল আর পাতা দিয়ে তারা বড় বড় মালা গাঁথবে। এই সময়কার এই নিয়ম,—গ্রামের প্রথা, লোকাচার।

কিন্তু বনের মধ্যে ঢোকবার আগে তারা এসে জমায়েত হল মনিব-বাড়ির আঙিনায়। এসে জুড়ে দিল গান, শুরু করে দিল নাচ। মেরি পাভলোভনা আর ভার্ভারা আলেক্সিভনা, দুই বেয়ানই বেশ ভব্যসভ্য হয়ে ঝকঝকে পোশাকে বেরিয়ে এলেন গাড়ি-বারান্দায়। হাতে বেঁটে ছাতা, রোদ আটকাবার জন্যে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন তাঁরা ভিড়ের কাছে, যেখানে গ্রামের মেয়েরা চক্রাকারে দাঁড়িয়ে গান ধরেছিল।

ইউজিনের সঙ্গে যে-মামাটি কিছুদিন হল বাস করছিলেন, তিনিও লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। ঝুনো লোক—স্ফূর্তিবাজ আর মদ্যপায়ী! মেয়েদের সংসর্গে কোনোদিনই তাঁর অরুচি নেই। এই সুযোগে, একটা রঙচঙে ঢিলেঢালা রেশমি চীনা-কোট পরে তিনিও এগিয়ে এলেন। ইচ্ছেটা, মেয়েদের সঙ্গে নাচ-গানে ভিড়ে পড়েন।

দূর থেকে দেখাচ্ছিল বেশ। উৎসব উপলক্ষে যেমন হয়ে থাকে, এক পাল তরুণী আর কিশোরীর দল চকচকে রঙিন পোশাক পরে বিচিত্র, বর্ণবহুল এক জনতার সৃষ্টি করে রেখেছে। তারাই হল সকলের লক্ষ্যবস্তু, প্রধান আকর্ষণের কেন্দ্রস্থল। আবার এদের চারদিক ঘিরে জটলা করে আছে এক-একটি ছোট দল,—এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে যেন বিচ্ছিন্ন, কক্ষচ্যুত গ্রহ-উপগ্রহের মতোন। কোনো দলে বা মেয়েরা পরস্পর হাত ধরাধরি করে ঘুরপাক খাচ্ছে। খসখস করে শব্দ হচ্ছে তাদের নতুন ছাপা ডিজাইনের পোশাকের। কোথাও-বা ছোট ছেলেরা ছুটোছুটি করছে, পরস্পরের পিছু ধাওয়া করছে, অকারণে হেসেই লুটোপুটি খাচ্ছে। আবার ওদের মধ্যে যারা বড়, সবে গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে এমন ছোকরার দল, তারা গাঢ় নীল কিংবা কালো কোট ও টুপি আর লাল কামিজ পরে বেশ গুরুগম্ভীর চালে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মুখ থেকে থু-থু করে ফেলে দিচ্ছে সূর্যমুখী ফুলের বীচি। ভাবটা যেন প্রাপ্তবয়স্ক গোছের। আর একপাশে দাঁড়িয়ে আছে সমীহভরে বাড়ির চাকর-বাকর আর বাইরের লোক। ওরা দেখতে এসেছে তামাশা। স্ফূর্তি আর মজা দেখবার কৌতূহলে ওদের চোখে-মুখে আগ্রহের দীপ্তি। দৃষ্টি রয়েছে সকলেরই মধ্যস্থলের নৃত্য-চক্রটির ওপর।

মেরি পাভলোভনা লিজার মা-র সঙ্গে এগিয়ে গেলেন অনেকটা, মাঝখানে যে-সব মেয়েরা নাচের জন্য তৈরি হচ্ছিল, তাদের কাছাকাছি। লিজাও গেল তাঁদের সঙ্গে। পরনে হালকা নীল রঙের পোশাক, মাথার চুলে দুলে-দুলে উঠছে ফিকে নীল রঙেরই রেশমি ফিতে। জামার হাতাগুলো বেশ বড় ও ঢিলে গোছের। নড়লে চড়লে লিজার ধবধবে শাদা, দীর্ঘ হাত দুখানি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, এমনকি হাতের কনুই পর্যন্ত। বাহু তার মাংসল নয়, কনুইয়ের কাছটায় উঁচু হাড় নজরে পড়ে।

ইউজিনের ইচ্ছে ছিল না যে, ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু সবাই যখন একে-একে বেরিয়ে এল, তখন একলা ঘরের কোণে লুকিয়ে বসে থাকার কোনো মানে হয় না। বরঞ্চ উলটে খারাপ দেখায়। তাই গুটি-গুটি সেও এসে দাঁড়াল গাড়ি-বারান্দার নিচে। মুখে একটা সিগরেট ধরানো, একটু কেমন অন্যমনস্ক চেহারা। যেন কিছুই হয় নি, এই ভাবটা। আর একটু এগিয়ে এসে আশপাশে জনতার দিকে তাকাল। ছেলে-বুড়োর দল মনিবের উপস্থিতিতে উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে তাদের গ্রাম্য অভিনন্দন জানাল। ইউজিনও মাথা হেলিয়ে তাদের অভিবাদন গ্রহণ করল। তারপর কাছেই দাঁড়িয়েছিল যে ছোকরা, তার সঙ্গে আজেবাজে কথা জুড়ে দিল নিছক সময় কাটানোর জন্যে।

ওদিকে মেয়েরা হঠাৎ সমস্বরে এবং তারস্বরেই একটা নাচের গান গেয়ে উঠল। ধীরে ধীরে নাচ জমে উঠল। একবার করে তারা পরস্পরের আঙুল ছোঁয়াছুঁয়ি করে আর নাচের তালে তালে হাততালি দিয়ে ওঠে।

লিজা প্রথমটায় হাততালির অর্থ বুঝতে পারে নি, ধরতে পারে নি আমন্ত্রণের ইঙ্গিত। একজন ছোকরা লিজার কাছে এগিয়ে এসে জানাল যে, মেয়েরা ইউজিনকে নাচের আসরে নিমন্ত্রণ করছে। ওরা চায় মনিবকে। অত দূরে দাঁড়িয়ে কেন? প্রধান দর্শক হিসেবে অন্তত তিনি কাছে এসে দাঁড়ান।

www.BanglaBook.org

লিজা মুখ ফিরিয়ে ইউজিনকে ইঙ্গিত করল। ইউজিন সরে আসতেই লিজা বলে উঠল, 'সত্যি, তুমি অত দূরে-দূরে রয়েছ কেন? আজ ওদের উৎসব, স্ফূর্তির দিন। বাড়ি বয়ে এসেছে, নাচ-গান করছে। ওরা চায় তুমি দেখ ওদের নাচ।'

তারপর একটি মেয়ের নাচে বিশেষ প্রীত হয়ে লিজা আবার বলে ওঠে, 'আর, দেখ দেখ, ঐ মেয়েটি কেমন নাচছে। বড় ভালো দেখাচ্ছে ওকে, না?'

মেয়েটি স্টিপানিডা। পরনে একটা উজ্জ্বল হলুদ রঙের স্কার্ট। গায়ে হাতকাটা ভেলভেটের ব্লাউজ। মাথায় চমৎকার ভঙ্গিতে একখানা রেশমি রুমাল বাঁধা। নৃত্যের তালে তালে উচ্ছল দেহ আর উজ্জ্বল পোশাকের রেখায়িত ভঙ্গিমা লিজার মুগ্ধদৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। স্বামীকে ডেকে বলে, 'দেখেছ? ঐ—যে! বেশ বড়-সড় চেহারা খুশিতে উপছে উঠছে যেন। মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। দেখে মনে হয় না—যেন দুরন্ত ওর জীবনীশক্তি, আমোদে আর উত্তেজনায় ভরপুর? আর চমৎকার নাচছে—যাই বলো তুমি…'

ইউজিন কিছুই বলে না। মানে, বলবার মতো মানসিক অবস্থা তখন নয়। চোখের সামনে যেন ধোঁয়া…কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ইউজিন। নৃত্যমণ্ডলী যেন অস্পষ্ট কুয়াশার কুণ্ডলী। একটা ঘূর্ণি-গতি…আর কিছু নজরে পড়ে না…।

'হ্যাঁ—হ্যাঁ—বেশ'…ইউজিন বলে ওঠে, কিছু না দেখে, না ভেবেই। অসহায় নির্বোধের মতোন একই উক্তি তার মুখে। বার বার, অর্থহীন, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ—বেশ ভালো', নাক থেকে প্যাঁসনে জোড়াটা খোলে, মোছে আবার লাগায় অন্যমনস্কভাবে। মনে-মনে বলে : 'ওর হাত থেকে দেখছি ছাড়ান পাওয়া আমার অদৃষ্টে নেই। কী করি!'

স্টিপানিডার মুখের দিকে ভালো করে তাকাতে পারে না ইউজিন। যেন তার সাহস গেছে নিঃশেষ হয়ে, ব্যক্তিত্ব গেছে ফুরিয়ে। দুর্বল আর অসহায় লাগে নিজেকে। মুখ তুলে খোলাখুলি ওর দিকে চাইতে ভয় করে। দুনিয়ার অপরাধীর লজ্জা এসে ভর করে মনের ওপর। চোখ নিচু করে রাখে, পাছে স্টিপানিডার দুর্নিবার আকর্ষণ উদগ্র মোহ বিস্তার করে তাকে কামনার জালে আবার বন্দি করে ফেলে।

তবু ওরি মধ্যে এক-আধবার আড়চোখে তাকিয়ে নেয় ইউজিন। হঠাৎ স্টিপানিডার একটা অতি-পরিচিত গতিভঙ্গি ইউজিনের অপাঙ্গদৃষ্টিতে ধরা পড়ে। চুরি করে চাওয়াটাই তখন যেন বেশি মিষ্টি লাগে…স্টিপানিডাকেও যেন আরো বেশি সুন্দর মনে হয়…মনে হয় যেন ও অনেক দূরের, বড় অচেনা, কখনো যেন আগে দেখে নি ইউজিন…কীরকম নতুন-নতুন লাগে স্টিপানিডাকে…

স্টিপানিডার চোখেও কেমন ঝলমলে দীপ্তি…লাস্যের লীলা ধরা পড়ে যায় ইউজিনের চকিত, মুগ্ধ চাহনিতে। স্টিপানিডাও মাঝে মাঝে কটাক্ষ-দৃষ্টিতে দেখে নিচ্ছে ইউজিনকে, বুঝে ফেলেছে তার চাপা মনোভাব। ইউজিন যে একটু দূর থেকে তাকেই দেখছে সুবিধা-সুযোগ মতো—একমাত্র তাকেই—লুকিয়ে-চুরিয়ে স্টিপানিডার প্রতিটি গতিভঙ্গি অনুধাবন করছে, সেটা তার আবিষ্ট দৃষ্টি থেকেই মালুম হয়। চকিত এবং তির্যক চাহনির অর্থভেদ করতে দেরি হয় না।

ইউজিন যেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার এই নীরবে দাঁড়িয়ে থাকাটা কেমন যেন দৃষ্টিকটু লাগে নিজেরই কাছে। ইউজিন সামলে নিতে চায় নিজেকে। সংবরণ করে তার অবাধ্য, প্রমত্ত দৃষ্টিকে। পাশ থেকে ভার্ভারা আলেক্সিভনার কণ্ঠস্বর শুনতে পায় ইউজিন। পাশুড়ি কী যেন বলছেন তাকে…'দেখো বাবা!' 'কী বলছেন?' বলে ইউজিন জবাব দেবার জন্যে মুখ ফিরিয়েছিল ভার্ভারা আলেক্সিভনার দিকে। কিন্তু তাঁর সেই কৃত্রিম, কপট ভদ্রতা আর আন্তরিকতাবর্জিত অকারণ অর্থহীন বাক্যস্রোতের কথা স্মরণ করে সারা গা-টা যেন ঘিনঘিন করে ইউজিনের…বিরক্তিতে টাটিয়ে ওঠে।

হঠাৎ কথাটা শেষ না করেই মুখ ফিরিয়ে নেয় ইউজিন। তারপর উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করে। বলা নেই, কওয়া নেই, সোজা বাড়ি পেরিয়ে, গাড়ি-বারান্দার নিচে দিয়ে সরাসরি গিয়ে ঢুকল বাড়ির মধ্যে।

এই-যে আকস্মিকভাবে ইউজিন চলে এল সকলের মধ্যিখান থেকে, নিজেকে গুটিয়ে নিল সন্তর্পণে—যাতে স্টিপানিডাকে আর দেখতে না হয়—আর বেশিক্ষণ চোখোচোখি না হয় তার সঙ্গে, তার কারণ হল এই যে, ইউজিন তার মনের ওপর এই ভীষণ চাপ, উত্তেজনার গুরুভার আর সহ্য

www.BanglaBook.org

করতে পারছিল না।

কিন্তু মজা এই যে, দোতলায় উঠে ইউজিন বারদিকের জানালার কাছে এগিয়ে গেল। কেন যে গেল আর কী করে গেল, তা সে নিজেই জানে না, ভেবেও বলতে পারে না। একটা যেন ভূতগ্রস্ত মানুষ, নিজের হাত-পায়ের স্বাধীন গতি সহসা লুপ্ত হয়ে গেছে। আশ্চর্য! যতক্ষণ মেয়েরা গাড়ি-বারান্দার কাছটায় জটলা করে রইল, ইউজিনও ওপরে জানালার পাশটিতে ঠায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। নিষ্পলক তার দৃষ্টি—চোখে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। দেখছে তো দেখছেই—বিশ্বের বিস্ময় আর অরণ্যের আগুন এসে লেগেছে তার চোখে। দেখছে তো দেখেই চলেছে স্টিপানিডাকে। এক লহমার জন্যেও চোখ ফেরাতে পারছে না—তনু-মন সমস্ত নিবদ্ধ হয়ে আছে অখণ্ড, একাগ্রভাবে একটি সঞ্চারিণী মূর্তির ওপর। ব্যগ্র লোলুপ দৃষ্টি, কৃপণের মতোন যেন সব শুষে নিতে চায়...

বাড়িতে এখন কেউ নেই। ইউজিনের গতিবিধি দেখবার মতো কোনো লোক কোথাও নেই। ছুটল ইউজিন—একরকম ছুটেই বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে ধীর পদক্ষেপে বারান্দায় এসে পৌঁছল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল, কেউ কোথাও আছে কি না, তাকে নজর করছে কি না। তারপর কিছুই যেন হয় নি, একটু বাগানের দিকটায় ঘুরে আসছে—এমনি ভাবখানা দেখিয়ে খুব ধীরে-সুস্থে, যত্ন করে একটা সিগারেট বার করে মুখে ধরল। গুটি-গুটি চলল বাগানের দিকে। কোন্ পথ দিয়ে বেরুল স্টিপানিডা? হঠাৎ অদৃশ্য হলই বা কোন্ পথে। বাগানের দিকে এল কি? উত্তেজিত, অস্থির চিত্তে এগিয়ে চলে ইউজিন।

সরু পথটা ধরে শুকনো পাতাগুলো মড়মড় করে মাড়িয়ে যায় ইউজিন। অশান্ত, বিক্ষিপ্ত তার মন, কিন্তু অভ্রান্ত, নিশ্চিত তার পদক্ষেপ। দু-কদম যেতে না যেতেই ঘন গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি যায় থেমে।

গাছের আড়াল থেকে দেখা যায় লাল আর হলদের আবছা আভাস। এগিয়ে আসে আর একটু...ঐ যে...কী যেন গোলাপি গোছের সরে গেল না! নিচের দিকটা ঘোর হলদে। আর ছোট ছোট কাঁটাওলা পাতার ফাঁক দিয়ে মনে হচ্ছে, একটা যেন লাল রঙের রেশমি কাপড় উঁচু করে ঝোঁপার ওপর দিয়ে জড়ানো—চট করে নড়ে গেল! আরও একটু এগিয়ে যায় ইউজিন। এবার নজরে পড়ে ভেলভেটিন জামার রঙটা। হ্যাঁ, হাত-কাটা ব্লাউজই বটে। শাদা বাহুর একটুখানি নগ্ন অংশ দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে আর-একজন স্ত্রীলোক। কোথায় যেন চলেছে ওরা।

ইউজিন ভাবে, 'কোথায় যাচ্ছে—কে জানে!'

তারপর হঠাৎ যেন সম্বিৎ হারিয়ে ফেলে ইউজিন। সংযমের শেষ বাঁধনটুকুও খসে পড়ে। সারা দেহ জ্বলতে থাকে অত্যুগ্র কামনায়—যেন একখানা হাত তার হৃৎপিণ্ডটাকে এসে আঁকড়ে ধরেছে। দেহ আর মনের জ্বলুনি থামতে আর চায় না। থরথর করে কাঁপতে থাকে উত্তেজনায়। হাঁটুর কাছটায় দুর্বল লাগে। একবার এদিক-ওদিক চোখ দুটো ঘুরিয়ে নেয়। চোখ দুটো যেন আর কারুর, দৃষ্টিটাও যেন অন্য মানুষের...তারপর সহসা স্টিপানিডার দিকে এগিয়ে যায় ইউজিন—তাড়াতাড়ি।

'ইউজিন ইভানিস! ইউজিন ইভানিস! আপনার কাছে এসেছি হুজুর'...ইউজিনের কানে ভেসে আসে এক কণ্ঠস্বর।

পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে, বুড়ো স্যামোখিন হাঁপাতে হাঁপাতে তার দিকেই আসছে। বৃদ্ধ মজুর স্যামোখিন ইউজিনেরই আদেশ অনুসারে বাগানের পিছন দিকে একটা কুয়ো খুঁড়ছে।

স্যামোখিনকে দেখে যেন চৈতন্য ফিরে এল ইউজিনের। নিজেকে সংযত করে নিল সে। উদ্যত পদক্ষেপ থামিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ইউজিন। তারপর স্যামোখিনের কাছে এগিয়ে এসে বুড়োর সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

কথা বলার ফাঁকে-ফাঁকে ইউজিনের দৃষ্টি চলে যায় তার লক্ষ্যবস্তুর সন্ধানে। নজর রাখে, কোন্ দিকে যাচ্ছে ওরা। দেখতে পেল, স্টিপানিডা আর সেই স্ত্রীলোকটি ঢালু জমি বেয়ে নিচের দিকে নেমে গেল কুয়োর কাছটায়।

সত্যি ওখানে কিছু দরকার আছে কিনা কিংবা মিছামিছি কুয়ো পর্যন্ত গেল ছল করে,—তা বলা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শক্ত। তবে ঐখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দু-জনে কী যেন বলাবলি করল। তারপর ফিরে এল আস্তে আস্তে...পরস্পর কথা বলতে বলতে। ওদের ধরন-ধারণ দেখলে মনে হয় যেন কী একটা জরুরি কাজে ওরা ব্যস্ত ছিল এতক্ষণ। কাজ শেষ করে ফিরছে।

কাছাকাছি এসে দু-জনেই জোরে জোরে হাঁটতে লাগল। ছুটেই চলল একরকম। নাচের আসরে ফিরে গিয়ে যোগদান করতে হবে আবার—বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। সঙ্গিনীরা অপেক্ষা করে আছে...।

১৩

স্যামোখিনের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে বাড়ি ফিরল ইউজিন।

মনটা বিষণ্ন, বিশ্রীরকমের ভারি হয়ে আছে। যেন এইমাত্র কাউকে খুন করেছে কিংবা কোনো সাংঘাতিক অন্যায় করে ফিরছে। মন খারাপ হওয়ার প্রধান কারণ হল, প্রথমত, স্টিপানিডা তার মনোভাব আঁচ করে নিয়েছে। ধরে ফেলেছে ইউজিন আবার তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। তাই ঘুরঘুর করে ঘুরছে পিছুপিছু। স্টিপানিডা সেটা বুঝেছে এবং নিজেও সেটা চায় বলেই খানিকটা এগিয়ে আসছে—যেন মেলে ধরেছে আপনাকে। আর ঐ স্ত্রীলোকটি আনা প্রোখোরোভা। স্টিপানিডার সঙ্গিনী। কাজেই সে-ও সব জেনে ফেলেছে—বুঝতে পারছে প্রতিটি ঘটনার, নড়া-চড়ার অর্থ। কী বিশ্রী লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু তারও চেয়ে বড় কথা হল ইউজিনের মানসিক অবস্থা। সে-যে বিজিত, পরাস্ত অদৃষ্টের কাছে—এইখানেই তার আফসোস, চরম লজ্জা। নিজের ওপর কর্তৃত্ব-যে তার ফুরিয়েছে, অদম্য ইচ্ছাশক্তি গেছে নিঃশেষ হয়ে—এইটেই আত্মার শ্রেষ্ঠ অবমাননা। নিজের খেয়ালখুশি মতো কাজ করার ক্ষমতা তার আর নেই, অপর কোনো একটা অদৃশ্য ইচ্ছাশক্তির অমোঘ ইঙ্গিতে তার সকল কর্ম আর প্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রিত হতে চলেছে। সেই অঙ্গুলি-সঙ্কেতই এখন তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আত্মশক্তির অধিকারী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কোনো বলিষ্ঠ পুরুষের পক্ষে এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কী থাকতে পারে? এতদিন সে-যে ডুবে যায় নি জন্মের মতো—এটা নেহাৎই দৈব ঘটনা, সৌভাগ্য। নইলে অধঃপতনের পথ তো সামনেই পড়ে রয়েছে। নিজেই এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে প্রশস্ত তোরণের নিচে—সামনে সুদৃশ্য পথ। প্রলোভনে মসৃণ, উত্তেজিত অনুমানে আর কল্পনায় স্নিগ্ধ, মধুর। ভাগ্য নিতান্তই সুপ্রসন্ন,—তাই অঘটন কিছু ঘটে নি ইতিমধ্যে। কিন্তু ঘটতে আর কতক্ষণ দেরি? আজ না-হয় কাল একটা কিছু সাংঘাতিক ঘটে যেতে পারে। অগ্নিগিরির গহ্বরের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে ইউজিন। বিস্ফোরণ আর অগ্নিস্রাবে ভস্মীভূত হতেই হবে একদিন...আজ না-হয় কাল!

হ্যাঁ—ভস্মীভূত হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কী বলা যায় একে? সম্পূর্ণরূপে তলিয়ে যাওয়া—একেবারে নষ্ট হয়ে যাওয়া...ইউজিন ভেবে পায় না, এইরকম বয়ে যাওয়াকে আর কী ভাষায় প্রকাশ করা যায়। অভিধানে আর তো কোনো কথা জোগায় না!

সকলের সজাগ দৃষ্টির সম্মুখে, গ্রামেরই একটা কৃষক-রমণীর সঙ্গে এইরকম একটা যৌন-সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে নিজের স্ত্রীর কাছে বিশ্বাসঘাতক হওয়া—একে নষ্ট হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কী বলা চলে? আর যে-স্ত্রীর প্রতি কোনো বিরুদ্ধ, বিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করা শুধু অসঙ্গত নয়—একেবারে অসম্ভব। লিজার কাছে সাফাই, কী কৈফিয়ৎ দিতে পারে সে? একেই বলে অধঃপতন। সম্পূর্ণ, নিশ্ছিদ্র অবনতি—একটুও ফাঁক নেই। আত্মক্ষালনের তিলমাত্র অবকাশ নেই। নিজের কাছে এতটা হেয়, অশ্রদ্ধেয় হয়ে বাঁচতে হবে তাকে সারাটা জীবন। নাহ্, কোনো ওজরই খাটে না! যে-স্ত্রীর তরফ থেকে এতটুকু ত্রুটির সন্ধান, ভালোবাসার অভাব, কসুরের খোঁজ পাওয়া যায় না—তার প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে নির্মম কৃতঘ্নের মতো বেঁচে থাকবে কী করে ইউজিন? অসম্ভব। জাহান্নামে যাওয়াটা এমন কিছু কঠিন, কষ্টসাধ্য কৃতিত্ব নয়। কিন্তু আত্মধিক্কারের অসহ্য অশান্তির নিত্য বিষক্রিয়ায় প্রতিটি মুহূর্তের সম্মুখীন হয়ে বাঁচবে কী করে মানুষ? নাহ্—একটা কিছু করতেই হবে, কোনো উপায়ে নিজেকে এই সাংঘাতিক মোহশৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে নিতেই হবে। নইলে চলবে না।

www.BanglaBook.org

'হায় ভগবান! এ কী কাজ আমি করতে বসেছি। কী করে উদ্ধার পাব? ঈশ্বর—আমার মনে বল দাও, শক্তি দাও যেন নিজেকে মুক্ত করতে পারি। নইলে এইভাবে আর কতদিন চলবে। শেষপর্যন্ত আমি কি তলিয়ে যাব, ডুবে যাব একেবারে?' নিজের মনে মনে বলে ওঠে ইউজিন। আক্ষেপে, অসহায় বোধে মন আর দেহ নুয়ে পড়ে, ভেঙে পড়ে।

আবার নতুন করে মনে জোর আনে ইউজিন। শাসনে মনকে সংযত করতে চেষ্টা করে। ভাবে, 'কিছুই কি করা সম্ভব নয় এখন? অবস্থা কি এমনি দাঁড়িয়েছে যে আমার আয়ত্তের বাইরে? কিছুই করবার নেই? কিন্তু নিশ্চেষ্ট, নিশ্চল হয়ে মেনে নেওয়াও তো চলে না!'

ইউজিনের পৌরুষ জাগ্রত হয়ে ওঠে। বোঝায় নিজের মনকে : 'না—নাহ্—একটা কিছু করতেই হবে। হ্যাঁ—ঠিক—ঠিক, স্টিপানিডার কথা আর ভাবব না। একেবারেই ভাবব না...'

মনের দরজা সশব্দে বন্ধ করে দেয় ইউজিন। যেন জোর করে ঠেলে বার করে দিতে চায় স্টিপানিডার প্রসঙ্গ। হুমকি দেখায় মনকে আর বলে : 'ওর কথা একদম ভাবা চলবে না—কিছুতেই নয়।'

সঙ্গে সঙ্গে উদয় হয় সেই এক চিন্তা, একই প্রসঙ্গ। ভেসে ওঠে স্টিপানিডার হাস্যময়ী মূর্তি...চোখের সামনে জেগে ওঠে প্লেন গাছের নিচে ছায়া-শীতল জায়গাটুকু...

কোথায় কী একটা বইয়ে যেন পড়েছিল ইউজিন এক সন্ন্যাসীর কথা। রোগের উপশমের জন্যে একটি স্ত্রীলোক একবার গিয়েছিল সেই সন্ন্যাসীর কাছে। স্ত্রীলোকটিকে দেখে তাঁর মনে জাগল দুর্বার কামনা। অথচ রোগিণীর গায়ে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করতে হবে। মহা মুশকিল! দক্ষিণ হাতটি প্রসারিত করতে গিয়ে সাধু বিচার করে দেখলেন, এ কী সাংঘাতিক অবস্থা! যে হাত দেবতার আশীর্বাদ বিতরণ করতে উদ্যত, সেই হাতই প্রলুব্ধ মুষ্টিতে আঁকড়াতে চায় রমণীয় দেহ! একটু থমকে গিয়ে ভেবে নিলেন। তারপর ডান হাত স্ত্রীলোকটির মাথার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বাঁ হাতটি ঢুকিয়ে দিলেন কাছে-রাখা জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্যে। আঙুলগুলো ঝলসে কুঁকড়ে বীভৎস হয়ে গেল!

ইউজিন ভাবতে লাগল সন্ন্যাসীর কথা। ইচ্ছাশক্তির ওপর অদ্ভুত এই কর্তৃত্ব। যতই ভাবে ইউজিন, মনে বল পায়। নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলে, 'হ্যাঁ, পারব। শোচনীয় অধঃপতনের আগে, একবারে ধ্বংস হয়ে যাবার আগে আঙুলগুলো পুড়িয়ে ফেলতে আমি প্রস্তুত।'

চারদিকে একেবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় ইউজিন। দেখে ঘর নির্জন কি না। তারপর দেশলাই জ্বেলে একটা মোমবাতি ধরিয়ে নেয়। ধীরে ধীরে একটা আঙুল এগিয়ে নিয়ে আসে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার কাছে। তারপর জোর করে ঢুকিয়ে দেয় আঙুলটা আগুনের মধ্যে।

'ভাব এবার...ভাব ওর কথা! আর ভাববে?'

নিজেকেই বিদ্রূপ করে ইউজিন। আঙুলে জ্বলুনি ধরবামাত্রই তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে নেয়। ধোঁয়ার কালো দাগ পড়েছে সবে, এখনো পুড়তে শুরু করে নি।

হো হো করে হেসে ওঠে ইউজিন আপন মনেই। দেশলাইয়ের বাক্সটা সজোরে মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দেয়। আর ভাবে—'কী ছেলেমানুষি আর বোকামি করছি! মাথা খারাপ হয়ে গেল দেখছি।'

নাহ্—এভাবে হবে না কাজ। আঙুল পুড়িয়ে চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন নেই। তবে একটা-কিছু করতেই হবে—করা দরকার—নইলে এ-রকম অহরহ দুশ্চিন্তার দায় তাকে ক্লান্ত উন্মত্ত করে ফেলবে।

এর চেয়ে কোথাও চলে যাওয়া ভালো। মানে, যেতেই হবে ইউজিনকে। কিংবা স্টিপানিডাকে সরিয়ে দিতে হবে বেমালুম কোনো এক দূর জায়গায়। যাতে পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎ আর না হয়...সম্ভাবনাও না থাকে।

হ্যাঁ, স্টিপানিডাকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু কী করে? ওর স্বামীকে কিছু টাকা দিয়ে বলতে হবে—এখান থেকে চলে যাও। শহরে গিয়ে নতুন ঘর বাঁধো। অবিশ্যি জানাজানি হয়ে যাবে ব্যাপারটা—তা ঠিক। লোকে ঠিক আঁচ করে নেবে, মানে বার করবে খুঁজে। অতিরঞ্জিত হয়ে পাঁচ কানে ঘোরাঘুরি করে কথাটা অযথা বেড়ে যাবে নিশ্চয়ই। কিন্তু তাতে কী? অপ্রীতিকর কানাঘুষো

www.BanglaBook.org

শুনতে মোটেই ভালো লাগবে না অবিশ্যি। কিন্তু উপায় কী? এই প্রত্যাসন্ন বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে-পড়া আর আত্মবিলোপের চেয়ে তো সেটা খারাপ নয়! একদিকে নিশ্চিত বিনাশ, অপর দিকে উদ্ধারের একটা প্রত্যাশা। কোন্‌টা ভালো?

নাহ্—করতেই হবে। ইউজিন নিজের মনকে বোঝায়। মনকে শক্ত করবার চেষ্টা করে। এ-প্রস্তাবটা পাড়তেই হবে কোনো গতিকে।

যতক্ষণ ভাবছে ইউজিন, মনে মনে এইসব নিয়ে এন্তাম করছে—চোখ দুটো তার রয়েছে স্টিপানিডার ওপরেই। একটি বারও, এই অস্বস্তিকর অথচ পরিষ্কার আত্মচিন্তার মধ্যেও, তার দৃষ্টি নড়ে নি, স্টিপানিডাকে ছেড়ে অন্য কোথাও।

হঠাৎ সমস্ত চিন্তার ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যায়—ভাবনার সূত্রটা ছিঁড়ে যায় টুকরো-টুকরো হয়ে। ইউজিন নিজেকেই প্রশ্ন করে ওঠে: 'কোথায় যাচ্ছে ও? কোন্ দিকে চলল আবার?'

বোঝা গেল, স্টিপানিডাও ইতিমধ্যে ইউজিনকে দেখেছে। বুঝেছে তার অনন্যদৃষ্টির অর্থ। ঠাহর করে নিয়েছে ইউজিন কেন চুপ করে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে দোতলার জানলাটির পাশে।

ওপর পানে একবার তাকিয়েছিল স্টিপানিডা। তারপর পাশের স্ত্রীলোকটির হাত ধরে চলল বাগানের দিকে আবার হনহনিয়ে। দ্রুত গতিভঙ্গিতে ডান হাতখানা দুলছে। চলে যাবার সময় একটা কটাক্ষ দৃষ্টি হেনে গেলে ইউজিনের দিকে...

ইউজিন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ। তারপর কেন, কী বৃত্তান্ত, কিছু না-ভেবে কিছু না স্থির করেই ইউজিন চলল কাছারি-ঘরের দিকে। হয়ত এতক্ষণ যে মতলব আঁটছিল স্টিপানিডাকে দূরে পাঠিয়ে দেওয়া সম্পর্কে, সেই পুরানো কথার চিন্তাসূত্র আবার ফিরে পেল ইউজিন...তাড়াতাড়ি চলল এগিয়ে।

ভ্যাসিলি নিকোলাইচ বসে ছিল নিজের কামরায়। গায়ে তার ছুটির পোশাক। বেশ একটু উৎসব আর সাজসজ্জার ঘটা। মাথার চুল তেল-চুকচুকে। পরিপাটি করে আঁচড়ানো এবং সিঁথি-কাটা। ঘরের মধ্যে ভ্যাসিলির স্ত্রী, আরেকজন অতিথি। অতিথির গলায় একখানা দামি রুমাল জড়ানো—রেশমি রুমাল, দেখলে মনে হয় প্রাচ্য দেশের তৈরি জিনিস। ওরা সবাই টেবিলে বসে একত্রে চা-পান করছিল।

ইউজিন একটু দূর থেকেই হাঁক দিলে:

'ভ্যাসিলি নিকোলাইচ, একবার আসতে হবে এদিকে। আপনার সঙ্গে দরকার ছিল একটু...'

'এই যে আসুন।' বলে শশব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে ভ্যাসিলি নিকোলাইচ। 'ভেতরে আসুন না হুজুর, আমাদের চা-খাওয়া হয়ে গেছে।'

'না, না, ভেতরে আর যাব না। আপনি একটু বেরিয়ে আসুন। দু-একটা কথা বলেই আমি চলে যাব।'

'আচ্ছা, আসছি আমি এক্ষুনি, টুপিটা আবার কোথায় গেল! ও তানিয়া, স্যামোভারটা (স্টোভ) নিভিয়ে দিস বাছা।' বলেই এগিয়ে এল ভ্যাসিলি। মুখখানা হাসি-হাসি, যেন খুশি উপচে উঠছে। চোখে কৌতূহলের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

ইউজিনের মনে হল, ভ্যাসিলি নিকোলাইচ এতক্ষণ মদ্যপান করছিল। এ-অবস্থায় তার কাছে কোনো কথা না পাড়াই ভালো। কিন্তু পরমুহূর্তেই ইউজিন ভেবে দেখলে, তাতে বিশেষ ক্ষতি হবে না। সুরার প্রভাব বরঞ্চ এক হিসেবে কার্যকরী হতে পারে। ভ্যাসিলি নিকোলাইচ-এর মন যদি রসার্দ্র এবং ভাবপ্রবণ থাকে, তাহলে, ইউজিনের সঙ্কট-অবস্থায় তার পূর্ণ মাত্রায় সহানুভূতি থাকবে।

ভরসা করেই বলে ফেলল ইউজিন, 'ভ্যাসিলি নিকোলাইচ! আপনার কাছে সেই কথাটাই আবার বলতে এসেছি—মানে, ঐ স্ত্রীলোকটি সম্বন্ধে...'

'কেন, কী হল আবার তাকে নিয়ে?' ভ্যাসিলি বিস্মিত জিজ্ঞাসা করে মনিবকে। বলে, 'আমি তো মানা করে দিয়েছি যেন ওকে আর কাজ না দেওয়া হয়!'

'না—সে কথা নয়। আমি জিনিসটা অন্যভাবে চিন্তা করে দেখেছি।' ইউজিন একটু থেমে, গলাটা

www.BanglaBook.org

পরিষ্কার করে নিয়ে আবার বলতে থাকে, 'আর—সেই সম্বন্ধেই আমি আপনার সঙ্গে একটু আলোচনা করতে চাই। মনে হচ্ছে, আপনার কাছ থেকে সে সুপরামর্শ পাওয়া যাবে। আচ্ছা, ওদের সমস্ত পরিবারকে এখান থেকে কোনোগতিকে একেবারে সরিয়ে দেওয়া যায় না? কেমন হয়, যদি বরাবরের মতোন অন্য কোথাও... ?'

'সে কী করে সম্ভব?' ভ্যাসিলি চিন্তিত সুরে প্রশ্ন করে। তার বলার ধরন থেকে ইউজিনের সন্দেহ হল যে, ভ্যাসিলি প্রস্তাবটিকে ঠিক সমর্থন করতে পারছে না। তাই কণ্ঠস্বরে অসম্মতি আর বিদ্রূপের আভাস। ভ্যাসিলি আবার বলে, 'কোথায় পাঠাবেন ওদের?'

ইউজিন একটু কুণ্ঠিত সুরে জবাব দেয়, 'ভাবছিলুম কি...ওদের কিছু টাকা ধরে দিলে কেমন হয়? কিংবা কিছু জমি—ভালো জমি—যদি কোলটোভস্কি অঞ্চল ওদের দিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে ওরা গিয়ে সেখানে নতুন করে ঘর তুলতে পারে, বসবাস করতে পারে। আর ওকেও এধারে ঘেঁষতে হবে না। চোখের সামনে এই যে অনবরত...'

'কিন্তু, হুজুর, ওদের সরানো যাবে কি? মানে, বলা মাত্রই এতদিনের পুরানো গেরস্থালি, ঘর-দোর, চেনা-শুনো আর বহু দিনের স্মৃতিসম্পর্ক সবকিছু ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে হুট করে ওরা যেতে চাইবে কি? যাওয়া মানেই, এখনকার মাটির গভীর যে শিকড় নেমে আছে সেটাকে সজোরে উপড়ে ফেলা! আমার তো মনে হয় না যে, ওরা রাজি হবে। আর সেটা সম্ভবও নয়। ওরা যদি চলে যেতে আপত্তি জানায়, সেটা অন্যায্য নয়। তা ছাড়া, দেখুন কথাটা ভেবে—ওদের খামোকা আপনি সরাতে চাইছেন কেন? ও যদি থাকেই গ্রামে, তাতে আপনার অসুবিধেটা কী? আপনার কী ক্ষতি ও করতে পারে, আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না... ।'

'আহ্, ভ্যাসিলি নিকোলাইচ—আপনি একটা সামান্য সহজ কথা ধরতে পারছেন না কেন? আমার স্ত্রী যদি এই ব্যাপারটা জেনে ফেলেন, ঘুণাক্ষরেও যদি কানাঘুষোয় খবরটা তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছয়, তাহলে কী হবে? সেটা ভেবে দেখুন...'

'কিন্তু, হুজুর, তিনি জানবেন কী করে, তাঁর কাছে লাগাতে যাবার মতোন মানুষ কই? কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে—আমি তা জানতে চাই...'

'ভ্যাসিলি নিকোলাইচ! বলতে না-হয় কেউ এগিয়ে না এল। কিন্তু, সমস্তক্ষণ, অহরহ, এই সন্দেহ আর ভয়—ধরা পড়ার দুর্ভাবনা নিয়ে আমি কাঁহাতক টিকে থাকি, বলুন! এই দুশ্চিন্তা কি পুষে রাখার সামগ্রী? এর চেয়ে যে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভালো। তা ছাড়া, হেস্তনেস্ত না হলে,—একটা ক্রমাগত অস্বস্তি বাড়তে বাড়তে...'

'হুজুর, আপনি অযথা ভয় পাচ্ছেন আর উত্তেজিত হচ্ছেন। সত্যি যদি কিছু না মনে করেন, তাহলে বলি—এটা বাড়াবাড়ি। মানুষের জীবনে কার না ভুল-চুক হয়? বলি, এমন লোক কে আছে—এই গ্রামেই হোক আর অন্যত্র কোথাও হোক—যার জীবন নিষ্কলঙ্ক, একদম পরিষ্কার, পবিত্র? তা কি কখনো হয়, না সম্ভব? আর আপনার অতীত জীবন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবার মতোন দুঃসাহস কার হবে—আমি সেটা জানতে চাই। নুড়ো আগুন জ্বেলে দেব না তার মুখে? আপনি মিছিমিছি একটা অহেতুক ভয়ে উদ্বিগ্ন হচ্ছেন। বলুন তো—দেশের রাজা কিংবা ভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে বুকে হাত দিয়ে কেউ বলতে পারে যে, তার জীবনে কোনো গোপন ঘটনা ঘটে নি, কোনো স্খলন হয় নি... ?'

'হতে পারে। আপনি যা বলছেন, ভ্যাসিলি নিকোলাইচ, হয়ত তা সত্যি। কিন্তু, তবু—ওকে সরিয়ে দেওয়া দরকার। গোড়া মেরে কাজ করাই ভালো। কোনো অপ্রীতিকর ব্যাপারের ছিট রাখতে আমি চাই না। ওর স্বামীর কাছে কথাটা একবার আপনি পেড়েই দেখুন না...পারবেন না?' ইউজিন অনুনয়ের সুরেই অনুরোধ জানায় ভ্যাসিলি নিকোলাইচকে।

ভ্যাসিলি নিকোলাইচ চুপ করে তাকিয়ে থাকে খানিকক্ষণ মনিবের মুখের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলে, 'না হুজুর, ওতে কোনো ফল হবে না। ওর স্বামীর সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা বলে কোনো লাভ নেই। মাঝখান থেকে অকারণে নিজেকেই খাটো হতে হবে। আর একটা কথা, ইউজিন

www.BanglaBook.org

ইভানিচ...আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—আপনার হল কী? ও তো অনেক দিনের কথা—কে আর মনে রেখেছে, বলুন? ও সব ধুয়েমুছে গেছে। কত কী তো ঘটে, পুরানো হয়ে যায়—মানুষ ভুলেও যায়। আপনার সম্বন্ধে কে এমন কু-কথা রটাবে, শুনি? সবাই তো দেখছে আপনাকে—আপনার হালচাল, আপনার কাজকর্ম, ঘরোয়া জীবন... !'

'তা হোক, তবু, আপনি একবার যান। গিয়ে কথাই বলে দেখুন না, ওর স্বামীর সঙ্গে...'

'বেশ ! যাব। যা বলছেন, তাই হবে।'

ভ্যাসিলি নিকোলাইচ-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ইউজিনের মন কিছু পরিমাণে শান্ত হল। স্টিপানিডাকে দেখে অবধি তার মনের মধ্যে আজ যে প্রচণ্ড আলোড়ন জেগে উঠেছে, সেটা যেন অনেকখানি কমে এল। ইউজিন অবিশ্যি জানে যে, এ-প্রসঙ্গ অর্থহীন। ভ্যাসিলিকে সে অনুরোধ করেছে বটে। কিন্তু বিশেষ কিছু লাভ যে হবে না এটা সে নিজেও আঁচ করেছে। তবু ভ্যাসিলির সঙ্গে এইসব কথা আলোচনা করে একটা বিষয়ে অন্তত সে আশ্বস্ত বোধ করে। উত্তেজনার বশে তার মাত্রাজ্ঞান হারিয়েছে। নইলে সামান্য একটা ঘটনা থেকে সে এতখানি বিপদের আশঙ্কা করবে কেন? কিছুই এমন ঘটে নি আজকে—যাতে ভবিষ্যতের আতঙ্কে সেই ঘটনাকে এতটা অযথা গুরুত্ব আর অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়! স্টিপানিডার সঙ্গে তার কি কোনো নীরব বোঝাপড়া হয়েছে? মোটেই নয়। পূর্বনির্দেশ আর সঙ্কেত অনুসারে সে কি তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল? অসম্ভব। তবে...?

ইউজিন ভাবে, 'আমার কী দোষ? আমি তো একটু বাগানের দিকে বেরিয়েছিলুম—বেড়াবার জন্যে। পায়চারি করছিলুম। ঠিক একই সময়ে স্টিপানিডাও ছুটে যাচ্ছিল ঐদিকে, হয়ত দরকারি কোনো কাজে। পরস্পর দেখা হবার মতো সুযোগ ঘটে গিয়েছিল। এটা তো আর অছিলা নয়! যোগাযোগ, একেই বলে আকস্মিক যোগাযোগ। তা ছাড়া আর কী?'

কাছারি-ঘর থেকে বাড়িমুখো রওনা হয় ইউজিন।

পথে আসতে আসতে অনেক কথাই ভাবে। মনকে বোঝায়, চোখ ঠারে। এ-ব্যাপারের মধ্যে তার নিজের কোনো হাত নেই—এই কথাটাই বার বার মনের মধ্যে গেঁথে নেবার চেষ্টা করে ইউজিন। উত্তেজনার তীব্রতা আস্তে আস্তে কমে আসে—মনটাও আবার একটু করে স্বাভাবিক প্রশান্তি খুঁজে পায় যেন।

১৪

দুপুরবেলার খাওয়া-দাওয়া পর্ব চুকে গেছে।

সেই দিনেরই ঘটনা।

লিজা মাঠের দিকে যাচ্ছিল বাগানটা ঘুরে। বাগানের স্নিগ্ধ ছায়ায় ঘোরাফেরা করে লিজার মনটা ভারি প্রসন্ন লাগছিল। হঠাৎ মনে পড়ল—মাঠে যেতে হবে। কথা ছিল ইউজিন তাকে ক্লোভারের ক্ষেত দেখাবে। দূরে দেখা যাচ্ছে—সারা মাঠটা যেন ফুলে-ফুলে ছেয়ে গেছে। অন্যমনস্কভাবে হাঁটছিল লিজা! যেতে যেতে, একটা ভুল করে বসল—হঠাৎ সামনের একটা ছোট্ট নালা পার হতে গিয়ে একটা পা পড়ল বেকায়দায়। সামান্য একটা খানা পার হওয়া এমন কিছু চিন্তার ব্যাপার নয়। কিন্তু অন্যমনস্ক ছিল বলেই যতটুকু লাফ দেওয়া দরকার তা হল না। ভুল পদক্ষেপের জন্য ডান পা-টা পড়ে গেল ঢালুর মুখে। আর ধুপ করে পড়ল লিজা, খানার মধ্যেই। কাত হয়ে পড়েছিল—এমন কিছু লাগবার কথাও নয় তার। কিন্তু উহ্ করে চেঁচিয়ে উঠতেই ইউজিন শুনতে পেল। এগিয়ে এসে তাড়াতাড়ি দেখল, লিজার মুখে শুধু ভয়েরই চিহ্ন নয়, ব্যথাও। মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে একমুহূর্তে। তুলতে গেল ইউজিন হাত বাড়িয়ে। কিন্তু লিজা ইশারা করে বারণ করল। সে দেখতে পেয়েছিল, মা আসছেন। এখুনি আবার সমালোচনা শুরু হবে, দিতে হবে কৈফিয়ৎ...ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে উঠল লিজা। কিন্তু পারল না। উঠতে গিয়ে সুবিধা করতে পারল না। একটু দুর্বল লজ্জার হাসি হেসে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা, তুমি

www.BanglaBook.org

একটু দাঁড়াও তো।'

আর একবার চেষ্টা করল নিজে নিজে, মাটিতে দু-হাত রেখে উঠতে গেল। পারল না। অপরাধীর মতো ভীতচকিত দৃষ্টিতে ইউজিনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হঠাৎ পা-টা কেমন যেন মচকে গেল...তাই...'

পেছন থেকে ভার্ভারা আলেক্সিভনার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর জেগে উঠল, 'এ-যে হবে, আমি জানতুম। বরাবরই বলে আসছি। এই অবস্থায় কেউ এত জোরে চলাফেরা করে—খানা-খোঁদল লাফিয়ে বেড়ায়? এখন বোঝ!'

বিরক্তিতে গর-গর করে ওঠেন ভার্ভারা আলেক্সিভনা।

'না, মা! কিছুই হয় নি। এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে—এই তো উঠছি আমি। কী আবার হবে...?'

ইউজিনের প্রসারিত হাতখানা ধরে টপ করে উঠে পড়ে লিজা, মনের জোরে। কিছুই যেন হয় নি—এই ভাব। কিন্তু দাঁড়িয়ে ওঠা মাত্রই তার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে ওঠে। ভয়ে মুখ পাংশু হয়ে যায়। তারপর...ভার্ভারা আলেক্সিভনার দিকে তাকায়। মুখখানা এগিয়ে নিয়ে মার কানে কানে ফিস ফিস করে বলে...'শরীরটা কী রকম যেন করছে, মা!'

'এ্যাঁ,—করছে কি?' ভার্ভার আলেক্সিভনা ভয়ার্ত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'এখন উপায়! কতবার বলেছি না পই পই করে—অমন ছুটোছুটি করে এদিক ওদিক বেড়িয়ো না! এখন কাণ্ড বাধিয়ে বসলে তো! দাঁড়াও দাঁড়াও—আগে চাকর-বাকরদের ডাকি। হেঁটে যাওয়া তোমার হতেই পারে না—নড়ো না একদম!'

ইউজিন লিজার পিঠে ও কোমরে হাত বুলোয় গভীর স্নেহভরে। মুখ নিচু করে বলে সান্ত্বনার সুরে, 'ভয় পেয়ো না। ভয় কিসের? আমি তো রয়েছি—তোমায় পাঁজাকোলা করে আমি একাই নিয়ে যেতে পারব।'

তারপর একটু কুঁজো হয়ে বাঁ হাত রাখে লিজার কোমরের কাছে। ডান হাতটা হাঁটুর নিচে জড়িয়ে ঝাঁ করে তুলে নিল লিজাকে নিজের বুকের কাছে। এমন কিছু ভারি নয়। ওকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে বাড়ির দিকে এগোয় ইউজিন। ক্ষণে ক্ষণে তাকায় লিজার মুখে। দেখে, ওর মুখে ও চোখে ভয়ার্ত বেদনার ক্লিষ্ট ছাপ। লিজার মুখের এই চেহারা কোনোদিন ভুলতে পারে নি ইউজিন—যন্ত্রণার এই অব্যক্ত উচ্ছ্বাস, বেদনার শুদ্ধ ও সংহত এই অমানুষিক পাংশু আভাস।

স্বামী তাকে অনায়াসে কোলে করে নিয়ে চলেছে—এই চিন্তায়, গর্বে ও আনন্দে লিজার ছোট্ট বুকখানি ভরপুর, যদিও থেকে-থেকে বেদনায় তার মুখখানা সিঁটিয়ে উঠছে। মুখটা এগিয়ে নিয়ে আসে ইউজিনের মুখের কাছে, অধর দিয়ে স্পর্শ করে স্বামীর মসৃণ ও শীতল কপোল। আস্তে আস্তে বলে, 'কত কষ্ট হচ্ছে তোমার! বুড়ো ধাড়িকে কোলে নিয়ে—ছিঃ ছিঃ। আর ভারিও তো কম নই। ঐ দেখো, মা তো ছুটতে শুরু করেছে, বারণ কর না...'

লিজার ইচ্ছেটা মা যেন ফিরে দেখেন—কত অনায়াসে সাবলীল ভঙ্গিতে ইউজিন তাকে পরম আদরে বুকের কাছটিতে নিয়ে, একটুও না হাঁপিয়ে, চলেছে সহজ পদক্ষেপে।

ইউজিন চেঁচিয়ে উঠল পিছন থেকে। ভার্ভারা আলেক্সিভনাকে ডেকে বলল, 'ছোটবার দরকার নেই। চাকরদের ডাকতে হবে না—আমি তো নিয়ে যাচ্ছি লিজাকে...'

ভার্ভারা তখন রীতিমতো উত্তেজিত। একটু থেমে পড়ে আরো হাঁকডাক শুরু করে দেন, 'ও মা! সে কী কথা! তুমি বয়ে নিয়ে যাবে কী করে! তারপর ফেলে দাও লিজাকে...মজাটা টের পাবে'খন..তোমার কি একটুও কাণ্ডজ্ঞান নেই, বাছা! মেয়েটা যদি হাত ফসকে একবার মাটিতে ঠুকে যায়, তাহলে হুমড়ি খেয়ে মারা পড়বে। তখন আর বাঁচতে হবে না...তোমার কি ইচ্ছে, ও মরুক!'

'কিন্তু আমি তো বেশ ভালোভাবেই নিয়ে যাচ্ছি লিজাকে...' ক্ষীণ স্বরে প্রতিবাদ জানায় ইউজিন। শাশুড়ির উত্তেজিত, বিচার-বুদ্ধিহীন, অনর্গল বাক্যস্রোতে শেষ পর্যন্ত সে অভিভূত হয়ে পড়ে। তবু বলে:

'আপনি শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছেন। আমি ঠিক নিয়ে যেতে পারব, বাড়ি পর্যন্ত।'

www.BanglaBook.org

'না না—তা হয় না, হতেই পারে না...' ভার্ভার আলেক্সিভনা বিরক্তিতে আর উত্তেজনায় হাত-পা নেড়ে যেন নাচতে থাকেন। বলেন, 'মেয়েটাকে মেরে ফেলো আর কি! মেরে ফেলেই তুমি নিশ্চিন্দি হতে চাও—না না, তা আমি করতে দেব না...লিজাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে না তোমাকে...' কথা শেষ না করেই ছুটে চলে যান সরুপথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে।

স্মিত-লজ্জিত হাসিতে সমগ্র মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে লিজার। ইউজিনের মুখের দিকে তাকিয়ে অপ্রস্তুতভাবে বলে :

'একেবারে পাগল! তুমি কান দিয়ো না ওঁর কথায়।'

তারপর একটু গম্ভীর হয়ে যায়। একটা দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ে মুখে। অন্যমনস্কভাবে বলে ইউজিনকে :

'শুধু শুধু ভাবনা কোরো না। ও কিছু নয়—সেরে যাবে খন।'

ইউজিনও গম্ভীর গলায় জবাব দেয়, 'হুঁ। গেল বারের মতোন গণ্ডগোল না হয়ে যায়...'

'না, না—আমি সে কথা বলছি না।' লিজা বলে ওঠে তাড়াতাড়ি, 'ও ঠিক আছে। আমি বলছিলুম, মা-র কথা। মানে, যা কাণ্ড করছেন এখন—এ-ভাবটা বেশিক্ষণ থাকবে না। ঠাণ্ডা হয়ে যাবেন শিগগিরই...আর দেখো—তোমার বোধ হয় কষ্ট হচ্ছে। একটু থেমে জিরিয়ে নিলে হত না?'

'না—এর জন্য আবার বিশ্রাম কিসের। আমার তো একটুও কষ্ট বোধ হচ্ছে না।'

ঠিক কষ্ট না লাগলেও একটু ভারি বোধ হচ্ছিল বৈকি। কিন্তু লিজার সামনে ইউজিন সেটা স্বীকার করতে চাইল না। বাড়ি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে চলল লিজাকে। নিজস্ব প্রিয় ভার আর কারুর হাতে তুলে দিতে মনে সরে না ইউজিনের। পরম যত্নে, সন্তর্পণেই লিজাকে বহন করে চলে। মাঝ পথে ঝি আর রাঁধুনি বামুন এসে পড়ে। ভার্ভারা আলেক্সিভনা ছুটে গিয়ে বাড়ি থেকে আগেভাগেই ওদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। মনিবের সামনে এসে দাঁড়ায় তারা। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসে, গিন্নিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্যে। কিন্তু ইউজিন ঘাড় নেড়ে বারণ করে, ইশারা করে সরে যেতে। একাই বয়ে নিয়ে যায় লিজাকে শোবার ঘর পর্যন্ত। তারপর সোজা ঘরে ঢুকে সরাসরি বিছানায় শুইয়ে দেয়। শুইয়ে দিয়ে কোমরটা সোজা করে চিতিয়ে দাঁড়ায়।

'নাও, এবার হয়েছে তো বাহাদুরি! এখন এস গে। বাইরে বসে একটু বিশ্রাম করে নাও।'

তারপর হঠাৎ ইউজিনের হাতখানা টেনে নিয়ে বুকের কাছটায় রাখে। তুলে ধরে হাতখানার ওপরে একটি আলগা চুম্বন রেখে বলে, 'তুমি এবারে একটু বিশ্রাম করো লক্ষ্মীটি। কিচ্ছু ভেব না—কিছুই হবে না আমার। অ্যানুসকা তো রয়েছে আমার কাছে—ওতে আমাতে ঠিক সামলে নেব'খন।'

মেরি পাভলোভনা থাকতেন বাড়ির একটি কোণে, স্বতন্ত্র অংশে। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে তিনিও দৌড়ে এলেন।

সবাই মিলে তখন তাড়াতাড়ি লিজার জামা-কাপড় ছাড়িয়ে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিল চটপট।

ইউজিন বাইরে গিয়ে বসেছিল এতক্ষণ বৈঠকখানায়। হাতে একখানা বই। মনটা কিন্তু অন্য দিকে। ভার্ভারা আলেক্সিভনা পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। মুখখানা তাঁর এতই থমথমে প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের ব্যঞ্জনায় গম্ভীর যে ইউজিন সাহস করে তাঁর সঙ্গে কথাই বলতে ভরসা পেল না। তবু মরিয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'দেখুন, ও কেমন আছে এখন? কী হয়েছে?'

'কেমন আছে, কী হয়েছে? আহ!' ভার্ভারা আলেক্সিভনা প্রায় ভেংচে ওঠেন জামাইকে, 'এখন জিজ্ঞেস করে আর কী হবে? যখন স্ত্রীকে খানা ডিঙিয়েছিলে, তখন মনে ছিল না? চেয়েছিলে বোধ হয় একটা কিছু কাণ্ড বাধুক!'

সর্বদেহ জ্বলে ওঠে ইউজিনের ঘৃণায় আর বিরক্তিতে। অনেক কষ্টে আত্মদমন করে বলে, 'কী আশ্চর্য! সোজা কথা বলতে পারেন না আপনি? আপনার সঙ্গে সাধারণ কথাবার্তা বলা তো দেখছি অসম্ভব হয়ে উঠল। যদি অপরকে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কথা বলে, নির্যাতন করে, জীবন তার বিষাক্ত

www.BanglaBook.org

করে দিতে চান শ্লেষ আর গঞ্জনায়—' ইউজিন বলতে যাচ্ছিল,—'তাহলে অন্য কোথাও যান, এ-বাড়িতে ও সব করবেন না!' কিন্তু অমানুষিক ধৈর্য ও সংযম ইউজিনের, বহু আয়াসে জিহ্বাকে সংযত করে নিয়ে বলে, 'তাহলে আপনার মনে কিছুতেই ব্যথা লাগে না, বুঝতে হবে। আঘাত পাবার মতোন হৃদয় আপনার নেই।'

'যা হবার তাই হয়েছে! এখন আর চারা নেই।' বোমার মতোন ফেটে পড়েন ভার্ভারা আলেক্সিভনা।

বিচারকের গম্ভীর রায় দিয়ে একটুখানি যেন প্রসন্ন দেখায় ভার্ভারাকে। তারপর বিজয়িনীর মতোন দৃপ্ত পদক্ষেপে, মাথার টুপিটা নেড়ে বসিয়ে দিয়ে ঘর থেকে খটখট করে বেরিয়ে যান।

ইউজিন দেখে—স্তম্ভিত হয়ে রোষ-কষায়িত নয়নে দেখতে থাকে পূজনীয়া শ্বশ্রূমাতার অপসৃয়মাণ মূর্তিখানি।

লিজা যখন হোঁচট খেয়ে পড়ল, বাইরে থেকে বোঝা যায় নি কিছুই। মনে হয়েছিল এমনি পা ফসকে পড়েছে—লাগে নি তেমন। কিন্তু দেখা গেল, সত্যিই লিজার পড়াটা হয়েছিল বিশ্রী রকমের অ্যাকসিডেন্ট। এতদিন ধরে সাবধানে, সতর্কভাবে থেকে—স্বামী, শাশুড়ি আর মায়ের কড়া নজরে বন্দি থেকেই ঘটে গেল এমন ধারা একটা আকস্মিক ঘটনা। বেকায়দায় পা ফসকে গিয়ে ওপর পা পর্যন্ত মুচড়ে গিয়েছিল। এখন কোমর থেকে বেদনা উঠছে। দ্বিতীয়বার সন্তাননাশের সমূহ সম্ভাবনা।

সবাই জানে, এ-সময়ে করবার কিছুই নেই। চুপ করে শুয়ে থাকা কেবল—নড়াচড়া বন্ধ। যদি সম্পূর্ণ বিশ্রামে আর নড়াচড়া-রহিত অবস্থায় শুইয়ে রেখে কোনো গতিকে সামলে যায়!

তবু একজন ডাক্তার ডেকে দেখিয়ে নেওয়া ভালো। সবাই মিলে তাই স্থির করলেন।

ইউজিন পড়বার ঘরে গিয়ে চিঠি লিখতে বসল ডাক্তারকে:

'প্রিয় ডাক্তার লিকোলাই সেমিওনিস,

আমাদের পরিবারের সঙ্গে আপনার সৌজন্য-সম্পর্ক বহুদিনের। বরাবরই আপনার কাছ থেকে আমরা সদয় ব্যবহার পেয়ে এসেছি। আশা করি এবারেও বঞ্চিত হব না। সম্প্রতি আমার স্ত্রী শয্যাশায়ী। অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় আছি। অবিলম্বেই আপনার সাহায্যের প্রয়োজন। আশা করি, পত্রপাঠ এখানে চলে আসতে দ্বিধা করবেন না।

গুণমুগ্ধ, ইউজিন আর্তেনিভ।'

চিঠিটা শেষ করে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ইউজিন আস্তাবলের দিকে। ঘোড়া আর গাড়ির তদারক করতে হবে।

ঘোড়ার সাজ পরিয়ে, গাড়িতে জুতে তবে ডাক্তারকে আনতে যেতে হবে। তারপর আবার তাঁকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। অনেক কাজ বাকি। সহিস ও কোচম্যানকে তাগাদা না দিলে সকাল সকাল বেরুনো অসম্ভব।

তা ছাড়া হৈ-হুজ্জুত, তাড়াতাড়ি করে এসব কাজ হয় না মফস্বলে। এ-তো আর শহর নয় যে, সময়ে-অসময়ে দু-দণ্ডের মধ্যে সব তৈরি হয়ে যাবে। তার ওপর জমিদারিটাও ছোট। ইউজিনের লোকবলও বেশি নেই। এ-অবস্থায় ধীরেসুস্থে বিবেচনা করে কাজ করতে হয়। তাই কোনো কিছুর বিলি-বন্দোবস্ত করতে গেলে একটু দেরি হওয়া স্বাভাবিক।

তবু ওরি মধ্যে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি মনস্থির করে ফেলে ইউজিন চলে গেল আস্তাবলের দিকে। কোচম্যানকে দিয়ে গাড়ি বার করিয়ে ঘোড়া জুতে রওনা করিয়ে দিল। যাবার সময়ে হাতে চিঠিখানা দিয়ে ভালো করে বুঝিয়ে দিল রাস্তার নিশানা—যাতে ভুল না হয়, দেরি না হয়ে যায়।

সমস্ত ব্যবস্থা সেরে, ইউজিন যখন বাড়ি ফিরল তখন রাত হয়ে এসেছে। ন-টা বেজে গিয়েছে।

ঘরে ঢুকে দেখল লিজা চুপচাপ শুয়ে আছে বিছানায়। কোনো ছটফটানি নেই। জিজ্ঞাসা করল কাছে এসে, 'এখন কেমন আছ? একটু ভালো বোধ করছ...?'

একটু ক্ষীণ হাসি হেসে লিজা জবাব দিল, 'বেশ ভালোই আছি। এখন আর কোনো ব্যথা নেই...'

অদূরেই বসে আছেন ভার্ভারা আলেক্সিভনা। কৌচে বসে কী একটা বুনছেন লাল রঙের। বোধ

www.BanglaBook.org

হয়, বাচ্চাদের গায়ে দেবার জন্যে ছোট্ট একখানা পশমি চাদর। পাশেই টেবিলের ওপর বড় ল্যাম্পটা। পাছে লিজার চোখে আলো লাগে, তাই কয়েকখানা বড় কাগজ, গানের স্বরলিপির শীটই হবে বোধ হয়—ল্যাম্পের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা হয়েছে।

লিজার বিছানার দিকটায় আবছা আলো। ঘরের কোণ অন্ধকার। আর ল্যাম্পের সমস্ত আলোটা গিয়ে পড়েছে লিজার মায়ের মুখে। সে-মুখ একবার দেখলে ভুল বোঝার অবকাশ থাকে না। ইউজিন ঘরে ঢুকে লিজার সঙ্গে যখন কথা কইছিল, তখন নজর করে নি। এখন মুখ ফিরিয়ে দেখল, ভার্ভারা আলেক্সিভনা অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে পশম বুনছেন। মেয়ে-জামাইকে যেন দেখতেই পাচ্ছেন না। মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। একটা ভুরু উঁচু হয়ে আছে, ধনুকের ছিলার মতো। মর্মভেদী প্রশ্নের বাণ—নিক্ষেপের অপেক্ষা মাত্র। মুখের ভাবখানা এই : যা হবার হয়ে গেছে। কিন্তু এরপরে সন্ধি অসম্ভব। অন্য লোকে যাই বলুক, আর যাই করুক, শান্তি-স্থাপনের প্রসঙ্গ বর্তমানে অবান্তর, অকল্পনীয়। তবে নিজের কর্তব্য তিনি যথারীতি করে যাবেন, যতক্ষণ আছেন এ-বাড়িতে। তার একচুল নড়চড় হবে না—এতটকু ত্রুটি হতে দেবেন না। অসুস্থ মেয়ে আগলে তিনি বসে থাকবেন...দরকার হলে সারারাত।

ইউজিন অবিশ্যি শাশুড়ি ঠাকরুনের এ-ভাবটা ভালো করেই লক্ষ করেছিল। কিন্তু দেখেও সে দেখল না। কারণ দেখলেই বিপদ। তাই এমন ভাবখানা সে দেখাল যেন কিছুই হয় নি। বেশ সহজ সুস্থভাবে, প্রশান্ত মনে এবং প্রফুল্লচিত্তে সে সকলের সঙ্গেই কথা বলতে লাগল। হঠাৎ নিজে থেকেই কথা তুলল, বলল, 'কাবুশকা নামে মাদি ঘোড়াটা চমৎকার ছোটে। ছোট্ট গাড়িখানাতে যখন বাঁয়া জুড়ি হিসেবে তাকে জুতে দেওয়া হল, রাশ টেনে তাকে সামলানোই মুশকিল হচ্ছিল। 'গ্যালপ' করে ছুটে বেরুনোর জন্যে সে তখন অস্থির।' গাড়ি জুড়বার আগে ইউজিনকে ঘোড়া নির্বাচন করতে হয়েছিল। কেননা, যে-দুটো সবচেয়ে তেজি এবং দৌড়ানোয় ওস্তাদ, তাদেরই পছন্দ করা দরকার। চটপট যাবে আর আসবে ডাক্তারকে নিয়ে।

'হ্যাঁ—তা তো বটেই। চমৎকার ব্যবস্থা তোমার!' ভার্ভারা আলেক্সিভনা এতক্ষণে মুখ খোলেন ফোড়ন কাটবার জন্যে। 'যে-সময়ে মানুষের প্রাণ নিয়ে টানাটানি—অবিলম্বে সাহায্যের দরকার—সেই সময়ে তোমার ঘোড়দৌড়ের শখ! ঘোড়াদের পরখ করা আর দৌড় শেখানোর কি এই সময়? যত্তো অ-ভু-ত খেয়াল তোমার। আশা করি, ডাক্তারবাবুকেও যথারীতি খানায় ফেলা হবে...।' বলেই ভার্ভারা পাতলা ঠোঁট দুটি একত্র বন্ধ করেন। হাতের পশম-বোনার কাজটা মুখ টিপে পরীক্ষা করেন অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে। সেলাইটা এগিয়ে নিয়ে এসে আলোর কাছে রাখেন, দেখেন ঠিক হচ্ছে কিনা। মুখে একটিও কথা নেই। মোক্ষম উত্তর দিয়ে চশমার ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ, সূচাগ্র দৃষ্টি হানেন সেলাইয়ের কাঁটা দুটোর ওপর। নীরবে কাজ চলতে থাকে দ্রুত নিপুণ হাতে।

ইউজিন শাশুড়ির অপ্রত্যাশিত নির্মম মন্তব্যে একটু হকচকিয়ে যায়। স্বচ্ছন্দ কথার ধারা ব্যাঘাত পেয়ে থমকে দাঁড়ায়। তবু সামলে নিয়ে বলে, 'বাহ্, আপনি তো সবই জানেন—দেখেছেন। গাড়ি তো পাঠাতেই হত। ঘোড়া না জুতলে গাড়ি কি হাওয়ায় উড়ে যাবে? ডাক্তারকে যখন খবর দিয়ে আনিয়ে নেওয়াই স্থির হল, তখন যা বন্দোবস্ত করা দরকার, তাই করেছি। অন্তত যা করা উচিত, ভালো বুঝেছি,—সেইমতোই ব্যবস্থা করেছি...এতে অপরাধটা কী করলুম?'

'হ্যাঁ...খুব মনে আছে আমার। মনে আবার থাকবে না? তোমার বাড়িতে একবার আসবার সময়ে গেটের খিলানের নিচে তোমার পক্ষিরাজরা গাড়িসুদ্ধ কী ঝাঁকুনিটাই দিয়েছিল আমায়! সামনের পা উঁচু করে, লেজ নেড়ে সে কী সাংঘাতিক লম্ফ-ঝম্ফ! কী চমৎকার গ্যালপ! খুব মনে আছে তোমার ঘোড়াদের কেরদানি। নাকালের একশেষ—পড়ে মরি আর কী!'

কথাটা অবিশ্যি বাড়াবাড়ি...মোটেই সত্যি নয়। ব্যাপারটা আগাগোড়াই কল্পনা। ভার্ভারা আলেক্সিভনা ভিতু মানুষ। আসলে তাঁর ভয়টাই অহেতুক।

তাই ইউজিন তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে বসে অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে। বলে, 'কিন্তু ব্যাপারটা তা তো নয়...'

www.BanglaBook.org

কথাটা না বললেই হত ভালো। কেননা, প্রতিবাদের উত্তরে বেরিয়ে আসে তীব্রতর শ্লেষ—অভ্রান্ত, তীক্ষ্ণ বক্রোক্তি।

'যা বলে থাকি, সেটা মিছে নয়।' ভার্ভারা আলেক্সিভনা সঙ্গে সঙ্গে ঠোক্কর দিয়ে বলে ওঠেন, 'এই তো সেদিন প্রিন্সকে তাই বলছিলুম...যারা মুখে এক, পেটে এক...হয়কে নয় করে—তাদের সঙ্গে বাস করা কঠিন। সব সইতে পারি। কিন্তু কপটতা আর মিথ্যে কথা আমি একদম বরদাস্ত করতে পারি না—ঐ আমার মস্ত বদরোগ...'

ইউজিন চুপ করে শোনে। তারপর বলে ওঠে, 'হুঁ, তবে এ-বিষয়ে যদি কাউকে সবচেয়ে বেশি ভুগতে হয়ে থাকে, তাহলে সে আমি...কিন্তু আপনি...?'

ভার্ভারা তৎক্ষণাৎ জবাব দেন, 'সে তো দেখাই যাচ্ছে...'

'কী বললেন?'

'কিছু না। সেলাইয়ের ঘর গুণছি...'

ইউজিন এতক্ষণ দূর থেকেই কথা বলছিল। দাঁড়িয়েছিল লিজার বিছানার পাশে। ভার্ভারার কথাবার্তা শুনে সে গুম হয়ে রইল।

লিজা শুয়ে শুয়ে স্বামীকে দেখছিল। তাকিয়ে ছিল তার মুখের পানে। মুখের ওপর যে ছায়া পড়ল, তা দেখে মনে কষ্ট পেল লিজা। কম্বলের ভেতর থেকে আস্তে আস্তে হাতটি বাড়িয়ে স্বামীর হাতখানি অলক্ষ্যে টেনে নিল নিজের হাতের মধ্যে। তারপর ইউজিনের হাতখানার ওপর একটু চাপ দিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। অর্থটা এই : দয়া করে মা-র কথায় কান দিয়ো না। আমার মুখ চেয়ে একটু সহ্য কর, ধৈর্য ধরো। মা যাই বকুন, আমাদের দু-জনের ভালোবাসায় ভাঙন ধরাতে পারবেন না তো!

লিজার পরিষ্কার, অর্থপূর্ণ দৃষ্টির উত্তরে ইউজিন ঝুঁকে পড়ে বিছানায়। ফিসফিস করে জবাব দেয়, 'ও কিছু নয়—তুমি ভেব না। আমি আর কথা না বললেই হল। কে ওঁর কথায় কান দিচ্ছে...!'

লিজার প্রসারিত দীর্ঘ হাতখানা নিজের ওষ্ঠের ওপর রাখে ইউজিন। হাতখানা নামিয়ে দিয়ে গভীর স্নেহে হাত বুলিয়ে দেয় মাথায়। ধীরে ধীরে ঝুঁকে পড়ে লিজার ঢলোঢলো চোখের কাছে—যে চোখের দুই তটে ভালোবাসা উদ্বেল হয়ে ছাপিয়ে পড়েছে। প্রগাঢ় অনুরাগের মতোন কী একটা অদ্ভুত, অবর্ণনীয় অনুভূতি ছেয়ে যায় ইউজিনের সর্ব অঙ্গে। পুলকরঞ্জিত অধর দিয়ে স্পর্শ করে লিজার সেই অপরূপ দৃষ্টি। আবেশে মুদিত হয়ে আসে লিজার ঘন চোখ দুটি।

ভয়ে ভয়ে কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করে ইউজিন : 'কেমন লাগছে এখন? একটু ভালো বোধ করছ কি? আচ্ছা দেখো, তোমার কি মনে হয়, গেল বারের মতোন আবার হবে নাকি?'

'বলতে ভয় করছে আমার। জানি না কী কপালে আছে...' নিজেরই অজ্ঞাতসারে লিজার দৃষ্টি চলে যায় কম্বলে ঢাকা পেটের দিকে। নিশ্বাস ফেলে বলে, 'আমার মনে হচ্ছে—বিশেষ কিছু চোট লাগে নি। বেঁচে আছে—আর, বোধ হয় বেঁচে থাকবে...'

তারপর একটু থেমে আবার বলে, 'আচ্ছা—সত্যিই যদি কিছু গোলমাল হয়ে যায়—তাহলে কী হবে? বার বার এমনি করে ব্যর্থতার দুর্ভোগ আমি কেমন করে সহ্য করতে পারব? ভাবতেই গা শিউরে ওঠে আমার...' হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চকিতে চোখ মুছে নেয় লিজা।

লিজা বার বার জেদ করতে লাগল ইউজিন অন্য ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুক। কিন্তু ইউজিন শুনল না। জোর করেই সে লিজার ঘরে রাত্তিরে শু'ল। সারারাত ঘুমোতেই পারল না ভালো করে। মনে ভয় সর্বক্ষণ—যদি কিছু দরকার হয় লিজার, ডেকে জবাব না পেয়ে শেষকালে নিজেই যদি উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে। অস্বস্তিতে আর উত্তেজনায় ইউজিনের মাথাটা ধরে ছিল। দু-চোখের পাতা বুজল না। শুয়ে শুয়ে ঠায় জেগে রইল সমস্তটি রাত।

কিন্তু ভালোয় ভালোয় রাত কেটে গেল। লিজার ঘুম ভালোই হয়েছিল। একটিবারও ওঠে নি সে রাত্তিরে। আর যদি ডাক্তারকে ডেকে আনার জন্যে লোক না পাঠানো হত, তাহলে হয়ত লিজা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিজেই উঠে পড়ত সকালবেলায়। একরকম জোর করেই তাকে চুপচাপ বিছানায় শুইয়ে রাখা হয়েছে।

মধ্যাহ্ন ভোজন-পর্বের আগেই ডাক্তার এসে পৌঁছুলেন।

বলা বাহুল্য, আসা মাত্রই তাঁকে রোগিণীর ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। রোগিণীকে পরীক্ষা করে তিনি যা বলে গেলেন, মোটামুটি তার সারমর্ম হল এই : যদি বেদনা প্রভৃতি উপসর্গগুলো আবার দেখা দেয় এবং ঘন ঘন হতে থাকে, তাহলে অবিশ্যি ভয়ের কথা। কিন্তু এখনো পর্যন্ত যখন উপসর্গগুলো আবার উৎপাত শুরু করে নি, তখন আশু বিপদের সম্ভাবনা কম—এ-কথা বলতে পারা যায়। কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও ঠিক যে, এই ধরনের ব্যাপারে কিছু জোর করে বলা চলে না—বলা যায় না। কেননা, বর্তমানে একটু উপশম হলেও, নতুন উপসর্গ এসে জুটতে কতক্ষণ?

তবে—যেহেতু একদিকে যেমন ভয়ের কারণ নেই বরং মনে হচ্ছে,—যতক্ষণ পর্যন্ত বিপরীত লক্ষণগুলো দেখা না দেয়—তেমনি আবার অপর দিকে উপসর্গের উপশম হওয়া মাত্রই বলা চলে না যে সঙ্কট-কাল কেটে গেছে,—যেহেতু বিশ্রাম এবং সম্পূর্ণ বিশ্রাম সেই বিপদের সম্ভাবনাকে চাপা দিয়ে রেখেছে মাত্র। পুরো ভরসা করে এ-অবস্থায় কিছু বলা অসম্ভব। তবে বর্তমানে রোগিণীর অবস্থা দেখে কিছুটা মতামত দেওয়া চলে...কেননা, একদিকে যেমন আসন্ন বিপদের আশঙ্কা কমেছে, অপর দিকে তেমনি...ইত্যাদি ইত্যাদি।

নানা-কারণ-দর্শিতায় পারদর্শিতা দেখিয়ে ডাক্তারবাবু যেসব বহুমুখী মন্তব্য করলেন, তার বিস্তারিত গোলকধাঁধায় আলোকরশ্মি বড় একটা প্রবেশ করতে পায় না। তবু ওরই মধ্যে বিশ্লেষণ-বাহুল্য সত্ত্বেও একটা ক্ষীণ আলোর রেখা যেন দেখা গেল। ডাক্তারবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন :

'তবে বিশ্রাম দরকার—সম্পূর্ণ বিশ্রাম। চলাফেরা, এমনকি নড়াচড়া একদম বন্ধ। আর অনর্থক ওষুধ দেওয়া আমি মোটেই পছন্দ করি না...তবে এই প্রেসক্রিপশান লিখে দিচ্ছি—মিকশ্চারটা আনিয়ে একবার এক্ষুনি খাইয়ে দিন বরঞ্চ। আর—হ্যাঁ ধন্যবাদ।' বলে দর্শনীয় টাকাটা পকেটে পুরে নিয়ে কী যেন গভীরভাবে ভেবে, আবার বললেন :

'হ্যাঁ—সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন। যেন অন্যথা না হয়—সেটার দিকে কড়া নজর রাখবেন।'

বলে ইউজিনের দিকে ফিরে একটু ঘাড় কাৎ করে মুচকি হাসলেন।

যাবার আগে তিনি আরেকবার বিশ্রাম সম্বন্ধে কড়া নির্দেশ ও সাবধানবাণী জানালেন আর দ্বিতীয় দফায় একটি বক্তৃতা দিলেন ভার্ভারা আলেক্সিভনাকে, স্ত্রীলোকের শারীর-তত্ত্ব সম্বন্ধে। ভার্ভারা খুব মনোযোগের সঙ্গেই ডাক্তারবাবুর বক্তৃতা শুনলেন, আর বড় সমজদারের মতোন মাথা নাড়তে লাগলেন। ভাবখানা এই : এ-সমস্তই আমার জানা, নতুন কথা আর কী?

ইউজিনের গাড়ি ফেরত গেল ডাক্তারবাবুকে পৌঁছে দিতে। লিজাকেও শুয়ে থাকতে হল বিছানায়, সপ্তাহখানেক।

১৫

এই সময়টা বেশিরভাগই ইউজিন কাটাত স্ত্রীর রোগশয্যার পাশে। নিজের কাজকর্ম কমিয়ে এনে, অধিকাংশ সময়টা সে ব্যয় করত লিজার ঘরে। কখনো-বা বিছানার পাশে বসে গল্প জুড়ে দিত। কখনো-বা একটা-কিছু পড়ে শোনাত—না-হয় লিজার মন ভালো করবার জন্যে এটা-সেটা, নানান কথা পাড়ত। কাটছিল মন্দ নয়,—রোগশয্যায় শুয়ে থাকার স্বাভাবিক বিরক্তি সত্ত্বেও।

কিন্তু মুশকিল বাধত—ভার্ভারা আলেক্সিভনাকে নিয়ে। স্বামী-স্ত্রীতে হয়ত কথা বলছে ওরা। বলা নেই, কওয়া নেই, ভার্ভারা এসে দুম করে বসতেন বিছানার পাশে চেয়ার একখানা টেনে নিয়ে। ব্যস—ওদের কথা যেত ফুরিয়ে। লিজা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠত,—মা-র কথাবার্তা হালচাল তার অজানা নয়। আর ইউজিনের দেহ-মন টাটিয়ে উঠত ভার্ভারার অর্থহীন কথা-কাটাকাটিতে। কখন কীভাবে কোন কথার সূত্রে—হয়ত নিতান্তই অবাস্তব প্রসঙ্গে,—তিনি বেঁকে বসবেন, শুরু করবেন বাঁকা কথা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর অন্তরজ্বলুনি ঠেস, তার কিছুই স্থিরতা নেই। ইউজিন চেষ্টা করত নিপুণভাবে, তাঁর অতর্কিত আক্রমণগুলোকে এড়িয়ে যেতে। কিন্তু সুবিধা করতে পারত না। ভার্ভারার অদম্য প্রাণশক্তি আর প্রকাশশক্তির দুর্নিবার উচ্ছ্বাসে ভেসে যেত ইউজিনের পুরুষোচিত স্থৈর্য। এক-এক সময়ে ধৈর্যচ্যুতি হত। কিন্তু অনেক কষ্টে, লিজার মুখ চেয়ে নিজেকে সামলে নিত ইউজিন। চেষ্টা করত শাশুড়ির অকারণ, মারাত্মক শ্লেষগুলোকে লঘুভাবে নিতে। সুস্থমনে বাঁচতে হলে, গুরুতর মনান্তরের হেতুকে হাসি-ঠাট্টায় পরিণত করা ছাড়া আর কী উপায় আছে...?

কিন্তু বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকবার উপায় ছিল না ইউজিনের। মানে,—সে থাকতে পেত না। প্রথমত, লিজা ভয়ানক রাগ করত, ঠেলে তাকে পাঠিয়ে দিত বাইরে। বলত, 'ও কী! পুরুষ মানুষ সমস্তক্ষণ ঘরে আবদ্ধ থাকবে কেন? যাও, খানিক ঘুরে এসো। চব্বিশ ঘণ্টা অসুস্থ মানুষের সঙ্গে চুপচাপ বসে থেকে-থেকে শেষকালে যে নিজেই অসুখ বাধিয়ে বসবে! আমি ও-সব পছন্দ করি না। তা ছাড়া—এমন কী হয়েছে আমার...?'

তারপর, দ্বিতীয় কারণ হল—ক্ষেতখামারের কাজ এখন পুরোদমে চলেছে। বাড়িতে এ-সময়ে বসে থাকলে তার সত্যিই চলে না। প্রতি কাজেই তার উপস্থিতি ও নির্দেশের প্রয়োজন। মাঠে, বাগানে, ক্ষেতে—সর্বত্রই কাজ হচ্ছে। এদিকে ফসল কাটার শেষে নতুন করে জমি চাষ হচ্ছে, ওদিকে বাগান সাফ করা চলছে—নতুন ফল-ফুলের গাছ লাগাতে হবে—আবার গোলাবাড়িতে ঝাড়াই-মাড়াইয়ের কাজ হচ্ছে। এ-সমস্ত কাজের দায়িত্ব আর ভার নেবার লোক কোথায়? জন-মজুররা তো খেটেই খালাস, তার মধ্যে অর্ধেক আবার ফাঁকির কারবার। ওদের খাটিয়ে নেওয়া দরকার। তার সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে লিজার পাশে অষ্টপ্রহর বসে থাকলে চলে না ইউজিনের। বেরোতেই হয়।

আর সর্বত্র...সর্বক্ষণ যেখানেই যায়...যখনই কাজকর্ম নিয়ে ঘোরাফেরা করে ইউজিন,—সেই এক চিন্তা। শুধু চিন্তা নয়—স্টিপানিডার জাজ্বল্যমান, জীবন্ত মূর্তিখানি মনের পটে নিত্য-নিয়ত প্রতিফলিত হয়ে থাকে। যেটুকু ভুলে থাকে স্টিপানিডাকে, সেটুকু নেহাতই কাজের চাপে। নইলে অক্টোপাসের মতোন স্টিপানিডার উজ্জ্বল চেহারা ইউজিনের মনকে আঁকড়ে থাকে।

নাগপাশের বন্ধনে এই যে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ হয়ে থাকা—এতেও তেমন কিছু মারাত্মক ক্ষতি হয়ত হত না। কেননা, মনেরই জোরে, মনের এই বন্ধন থেকে হয়ত ইউজিন নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারত। কিন্তু মুশকিল হল অন্য জায়গায়। আগে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে গিয়েছে স্টিপানিডার অদর্শনে। কেননা, ইউজিনের সঙ্গে কৃচিৎ, কালে-ভদ্রে দেখা হত স্টিপানিডার। এখন হামেশাই দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছে, চোখাচোখি হয়ে যাচ্ছে। ইউজিন যে আবার তাকে গ্রহণ করতে চায়, চায় পূর্বেকার সম্পর্ক স্থাপন করতে—এটা ক্রমশই পরিস্ফুট হয়ে উঠছে স্টিপানিডার কাছে। ইউজিনের গোপন মনোভাবটা তার কাছে বেশ স্বচ্ছ এবং বোধগম্য হচ্ছে বলেই সে ইউজিনের চোখের সামনে মেলে ধরছে নিজেকে—ছলা-কৌশলে তার পথে এসে দাঁড়াচ্ছে। অবিশ্যি সামনাসামনি, পষ্টাপষ্টি কোনো কথা হয় নি আজও উভয়ের মধ্যে। দু-তরফই নীরব এবং নির্বাক। কেউই কোনো প্রকাশ্য প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসে নি। তাই সঙ্কেত-স্থল নির্দিষ্ট করে দু-জনে একত্র মিলতে পারে নি। কিন্তু উভয়েই স্পন্দিত প্রতীক্ষায় উন্মুখ, কম্পমান হয়ে আছে। দু-জনের চোখেই আগুন ঠিকরে পড়ছে—স্ফুলিঙ্গবাহী দেহ-স্পর্শের অপেক্ষামাত্র।

দু-জনের একমাত্র মিলিত হবার জায়গা হল বনের মধ্যে কোনো নিভৃত স্থান। একমাত্র সেইখানেই কিছুক্ষণ নির্বিঘ্নে দেখা-সাক্ষাৎ কথাবার্তা চলতে পারে। অন্যত্র শুধু বিপজ্জনক নয়—অসম্ভব।

বনের মধ্যে কাঠ কুড়োতে যায় চাষির ঘরের বৌ-ঝিরা। সঙ্গে বড় বড় থলে বা বোরা নিয়ে যায় গরুদের খাবার ঘাস আনবার জন্যে। ইউজিন জানত এ-সংবাদ। প্রায়ই দেখতে পেত মেয়ের দল যাচ্ছে বনের দিকে। তাই গোপনে সে-ও যেত বনের দিকে। রোজ রোজ ঘুরত, টহল দিত বনপথে আশায় আশায়। প্রত্যেকদিন ইউজিন প্রতিজ্ঞা করত, ও-পথে আর সে যাবে না। ভাবত—আজই

www.BanglaBook.org

শেষ যাওয়া। আর প্রতিদিনই শেষ পর্যন্ত গুটিগুটি চলে যেত বনের মধ্যে। মেয়েদের সমবেত কলস্বরে চকিত হয়ে লুকিয়ে পড়ত। আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে থাকত নিস্তব্ধ প্রতীক্ষায় হয়ত কোনো ঝোপের পেছনে—যদি স্টিপানিডা এসে থাকে, দেখা হয়ে যায় তার সঙ্গে। প্রথম মিলনের বেপথু হৃদয়ের মতোই কেঁপে উঠত তার হৃৎপিণ্ড আকুল আকাঙ্ক্ষায়, অনিশ্চিত মিলনের অধীর আগ্রহে।

কেন যে ইউজিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাত বনের মধ্যে ব্যগ্র প্রতীক্ষায়, স্টিপানিডা এসেছে কি না, মেয়েদের দলের মধ্যে তার সুপরিচিত চেহারা দেখা যায় কি না—শুধু সেইটুকু দেখবার জন্যে,—ইউজিন তা নিজেই জানে না। বলতেই পারে না তার এই ছেলেমানুষী কৌতূহলের অর্থ। যদিই বা স্টিপানিডা থাকত ঐ দলে, দেখা হয়ে যেত একলা তার সঙ্গে—কেউ কোথাও নেই, নিভৃত বনের নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন একটি কোণে, ইউজিন কখনোই তার সামনে মুখোমুখি এগিয়ে এসে দাঁড়াতে পারত না। অন্তত সে তাই মনে করে। ভাবে—যদি এমনি অভাবিত সুযোগে পরম-ঈপ্সিত দেহাধিকারিণীকে হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়া যেত, তা হলেও সে পালিয়ে যেত দূরে—অনেক দূরে।

তবু ইউজিন নিত্য হাজিরা দেয় বন-পথে। শুধু চোখের দেখা দেখতে চায় স্টিপানিডাকে...

একদিন দেখা হয়ে গেল ঘটনাচক্রে।

ইউজিন ছোট জঙ্গলটা পেরিয়ে বনের মধ্যে সরু পথটা ধরেছে। এমন সময়ে পথের বাঁকে দেখা গেল স্টিপানিডাকে।

স্টিপানিডা বেরিয়ে আসছে বন থেকে। সঙ্গে আর দু-জন স্ত্রীলোক। পিঠে একটা করে ভারি বোরা—শুকনো ঘাসে বোঝাই। আরেকটু আগে হলে বনের মধ্যেই দেখা হয়ে যেত দু-জনার। একটুর জন্যে ফসকে গেল। এখন আর কী করে হয়? দু-জন সঙ্গিনী রয়েছে। তাদের কি অছিলায় সরিয়ে দেবে স্টিপানিডা? ফিরে যাবে ইউজিনের সঙ্গে একলা বনের মধ্যে? শুধু দৃষ্টিকটু নয়—অসম্ভব।

স্টিপানিডাকে একলা কাছে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই ক্ষীণতম—এটা জেনে এবং বুঝেও ইউজিন একটা হেজেল গাছের আড়ালে সরে গেল চট করে। দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ নিচু ঝোপটার পিছনে। পথ থেকে তাকে যে-কোনো মুহূর্তে অপর দু-জন স্ত্রীলোক দেখে চিনে ফেলতে পারে—তা জেনেও ইউজিন নড়তে পারল না নিজের জায়গা ছেড়ে।

বলা বাহুল্য, স্টিপানিডা আর ফিরে এল না। তবু ইউজিন দাঁড়িয়ে রইল কী যেন আশায়। কী আশ্চর্য...দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটুও ক্লান্তি বোধ হল না তার। বরঞ্চ মনে হতে লাগল সময়টা কোথা দিয়ে যেন উড়ে গেল। লঘুপক্ষ পাখির মতোন স্টিপানিডাও যেন ভেসে চলে গেল নিমেষে, নীল শূন্যকে চিরে দিয়ে। তারপর—অদ্ভুত, নিঝুম নিস্তব্ধতা। খালি বুকের টিপটিপ শব্দ শোনা যায়—আর কিছু না। সেই নিঃসীম, নিঃসঙ্গ শূন্যতাকে পূর্ণতর রূপ দেয় স্টিপানিডার বিলীয়মান মূর্তি। আর কল্পনায় কত লোভনীয়, কত চিত্তবিভ্রমকারী সেই মূর্তি। শব্দহীন পদক্ষেপে ইউজিনের গভীরতম সত্তার দ্বারদেশে এসে প্রতীক্ষায় ও সমর্পণের রভস-লীলায় যেন উদ্বাহু হয়ে দাঁড়ায় সেই কল্পিতা অভিসারিণী।

এ-ব্যাপারটা একবার নয়, দু-বার নয়—ঘটল পাঁচ-ছ-বার। আর প্রতিবারই কামনার আবেগ যেন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগল। স্টিপানিডার প্রতি এতখানি আকর্ষণ যেন এর আগে ইউজিন এত বেশি করে অনুভব করে নি। প্রতিবারই মনে হয়—আরো সুন্দর, আরো বেশি সুন্দর হয়ে উঠেছে স্টিপানিডা। এইভাবে, আবার একটু একটু করে স্টিপানিডার দুর্ভেদ্য মায়াজালে বন্দি হয়ে পড়ল ইউজিন। তার সবল ইচ্ছাশক্তি এবং দৃপ্ত পৌরুষ কখন, কী করে, ধীরে ধীরে এই আকর্ষণের কাছে পরাস্ত হল,—এই দাসত্বকে প্রতিরোধ করতে একটুও তাকে সাহায্য করল না, তা ইউজিন নিজেই ভালো করে ঠাহর করতে পারল না।

মাঝে মাঝে মনে হয় ইউজিনের, সে বুঝি পাগল হয়ে গেছে। নইলে জ্ঞাতসারে, আবার এমন করে সে ডুবতে বসল কেন? বুঝতে পারে, মনের ওপর তার দৃঢ় অধিকার, কঠিন সংযম একেবারে লুপ্ত হয়েছে। বিবেচনাবুদ্ধি সে এখনো হারায় নি—এটা ঠিক। নিজেকে এখনো সে বিচার করতে পারে দূর থেকে—নিরাসক্ত, আত্মস্থ দৃষ্টিতে। নির্মম আত্মবিশ্লেষণের বলিষ্ঠতা তার মনন-শক্তির

www.BanglaBook.org

মেরুদণ্ডকে এখনো খাড়া রেখেছে। বেশ বুঝতে পারে ইউজিন তার ব্যভিচারের কুৎসিত দুর্বলতা। কোনো সাফাই কৈফিয়ৎ নেই তার এই জঘন্য কামনার, এই অশ্রদ্ধেয় নীচ কর্ম-প্রবৃত্তির। প্রবৃত্তি তো বটেই! কেননা, সে তো জেনে-শুনে, বুঝে এবং আশা করেই রোজ বনের দিকে ছুটেছে দিশাহারা হয়ে।

ইউজিন জানে—ভালো করেই জানে—একবার অন্ধকারে স্টিপানিডার কাছে আসার অপেক্ষা মাত্র। সম্ভব হলে, অঙ্গস্পর্শ ঘটলেই সে আগুনের মতোন দাউদাউ করে জ্বলে উঠবে। নিজেকে সংযত রাখা তখন ইউজিনের অসম্ভব হয়ে উঠবে—কোনোমতেই সামলানো যাবে না। ইন্দ্রিয়জ মোহে ধৈর্যের বাঁধ যাবে ভেঙে—ধসে। ইউজিন এটাও জানে, ভেবে দেখেছে—এত দিন একটা যে কিছু ঘটে যায় নি, সেটা নিতান্তই দৈব ঘটনা। স্থান-কাল-পাত্রের এবং সুযোগ-মাফিক যোগাযোগের অভাব। নিজেকে কোনোমতে এতদিন সে-যে আটকে রাখতে পেরেছে সেটাতে তার নিজস্ব কৃতিত্ব কিছুই নেই। নেহাতই লজ্জা, ভয়, চক্ষুলজ্জা। অন্য লোকে পাছে জেনে ফেলে, সেই কারণে লজ্জা। স্টিপানিডা তাকে কী ভাববে,—হাতের পুতুল মনে করবে, সেই কারণে লজ্জা। আর নিজের কাছে নিজের লজ্জা—হেয় অশ্রদ্ধেয় হয়ে যাবার স্বাভাবিক ভয়ের বাধা।

যেটা গভীরতম লজ্জার কারণ, সেটা হল এই : ইউজিন নিজেই এ-যাবৎ এমন সুবিধা-সুযোগ খুঁজছে যাতে সেই লজ্জা-সঙ্কোচ চাপা পড়ে যায়। স্টিপানিডার দৈহিক সান্নিধ্য আর অন্ধকারের আশ্রয়-ভিক্ষা—সে তো তার কাপুরুষতারও চরম নিদর্শন। তা ছাড়া, আর কী বলা যায়? ইউজিন মনে মনে কামনা করেছে, খুঁজেছে এমন একটা পরিবেশ যেখানে পাশববৃত্তি অন্ধকারে বিবেকবুদ্ধির টুটি টিপে ধরে—কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না—ভদ্র-শিক্ষিত মনের ন্যায্য-সঙ্গত প্রতিক্রিয়া চাপা পড়ে যায় ইন্দ্রিয়ানুভূতির অসহ্য উত্তেজনায়।

তাই ইউজিন মনে মনে ভাবে, তার মতোন জ্ঞানপাপী দুনিয়ায় নেই। জানছে, বুঝছে সবই। তবু নির্ভুল পদক্ষেপে সে এগিয়ে এসেছে মনুষ্যত্বের চরম অধঃপতনের প্রান্তদেশে। মনে হয়—তার মতোন দুর্বৃত্ত আর কেউ নেই। সমস্ত অন্তর ভরে ওঠে নিজের প্রতি নিজেরই সঞ্চিত বিতৃষ্ণার বিষে। অবুঝের মতন, অন্ধ-উন্মাদের মতোন যদি সে ঝাঁপ দিত, তাহলে এতটা আত্মানুশোচনার কারণ থাকত না। কিন্তু এ-আত্মসমর্পণের প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ হচ্ছে সজ্ঞানে,—একরকম ইচ্ছাকৃত বলাই চলে। তাই আত্মধিক্কার বাড়তে থাকে...সারা মনপ্রাণ দিয়েই সে ঘৃণা করে আপনাকে...ভীষণভাবে ঘৃণা করে।

ইউজিন প্রাণপণ চেষ্টা করে প্রলোভনের হাত থেকে উদ্ধার পেতে। ঐকান্তিক প্রার্থনা জানায় ঈশ্বরের কাছে : 'আমাকে শক্তি দাও, হে ভগবান! নিশ্চিত ধ্বংস থেকে আমাকে পরিত্রাণ কর। মনে বল এনে দাও—যেন এই অন্ধ, উন্মাদ মোহ কাটিয়ে উঠতে পারি।'

প্রতিদিনই ইউজিন প্রতিজ্ঞা করত মনে মনে : 'আর নয়। এই শেষ। আজ থেকে স্টিপানিডার সমস্ত চিন্তা, ওর প্রসঙ্গ ভুলে যাব—মন থেকে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করে দেব। ওকে দেখবার জন্যে এগিয়ে যাব না—এক পা-ও বাড়াব না। চোখের দেখা দেখবার জন্যে এই হীন কাঙালপনা—এর চেয়ে আত্মসম্মানের হানি, নৈতিক অধঃপতনের প্রমাণ আর কিছু হতে পারে না।'

প্রতিদিন ইউজিন চেষ্টা করে নিজের মনকে বোঝাতে। এই দুর্দম প্রলোভনকে জয় করবার উপায়-কৌশল খোঁজে। চেষ্টা করে—মতলব কাজে লাগাতে, নানা ফিকির-ফন্দি খাটিয়ে।

কিন্তু সমস্তই ভেস্তে যায়। তার ঐকান্তিক আগ্রহ, আত্মরক্ষার যত-কিছু পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায় পণ্ডশ্রমে।

ইউজিন যে-সমস্ত উপায় ঠাউরেছিল, তার মধ্যে একটি হল, নিজেকে সমস্তক্ষণ কাজে ডুবিয়ে রাখা, কোনো দ্বিতীয় প্রসঙ্গের চিন্তাবকাশ যাতে একদম না পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় উপায় হল—প্রচুর কায়িক পরিশ্রম আর মধ্যে মধ্যে উপবাস। নিত্য-নিয়মিত দেহশ্রমে আর উপবাস-বিধিতে দেহ-মন ক্ষীণবল হয়ে আসবে, ঘুচবে উত্তেজনা।

তৃতীয় উপায় হল—কল্পনা-চিত্রের সাহায্যে বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করা। পরিষ্কার ছবি

www.BanglaBook.org

আঁকত ইউজিন মনে-মনে,—যখন সবাই তার গোপন অবৈধ আকর্ষণের কথা জেনে ফেলবে, তখন কী হবে! মেরি পাভলোভনা, ভার্ভারা আলেক্সিভনা, লিজা আর দেশের লোক যখন জানতে পারবে, তখন কী ভয়াবহ সঙ্কট-অবস্থা দাঁড়াবে। শাশুড়ি, স্ত্রী ও মা-র সামনে—পরিচিত অনাত্মীয়দের সামনেই বা কী করে মুখ তুলে দাঁড়াবে ইউজিন?

রোজই এইসব কথা ভাবে ইউজিন, নানা চিন্তায় ও কৌশলে নিজের মনকে দৃঢ় ও কঠিন করে তোলে। মনে হয়—একটু একটু করে যেন কাজ হচ্ছে, প্রলোভনের ধার কমে আসছে ধীরে ধীরে।

সময়ের নির্ভুল কাঁটায় আবার ঘুরে আসে সেই নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর। মধ্যাহ্নের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, খর আলো তার প্রখর আশার থরথর দীপ্তি নিয়ে কাঁপে চোখের সামনে। মনে পড়ে যায় আগেকার ঘটনাগুলো। সুস্পষ্ট ছবির গভীর অবিস্মরণীয় রেখা উচ্ছল উজ্জ্বলতায় নিভৃত বনপথের কুঞ্চিত ছায়ায় তাদের সেই সঙ্কেতস্থল, প্রতীক্ষায় উচাটন সেই আশ্চর্য মুহূর্তগুলো...ঘাসের বোঝা পিঠে নিয়ে চলেছে স্টিপানিডা...আর অধীর আগ্রহে, উদগ্র কামনায় চোরের মতোন সন্তর্পণে বনের সুঁড়ি-পথে দাঁড়িয়ে সে নিজে,...লতান্তরিত দেহ, কবোষ্ণ নিশ্বাস...

এইভাবে কাটল পাঁচদিন। পাঁচটি দিন আর রাত-ভোর ইউজিন লড়াই চালাল নিজেরই সঙ্গে। আত্মদমন আর আত্মনিগ্রহের ক্ষতচিহ্ন যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠল তার মুখে-চোখে, সর্ব অঙ্গে।

দূর থেকে শুধু দেখল ইউজিন স্টিপানিডাকে...একবারও মুখোমুখি হল না তার সঙ্গে...।

লিজা ক্রমশ ভালো হয়ে উঠতে লাগল। তবে আস্তে আস্তে একটু একটু করে। অনেকদিন বিছানায় শুয়ে থেকে-থেকে প্রথমটা চলাফেরা করতে কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকত। এখন অবশ্য আর তেমন ঠেকে না। অভ্যেস হয়ে এসেছে—লিজা স্বাভাবিকভাবেই ঘোরাফেরা করে আজকাল।

তবে একটা জিনিসে মনে ভারি অস্বস্তি বোধ হয়। স্বামীর ভাবান্তরের হেতুটা সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। ইউজিনের এই আকস্মিক মানসিক পরিবর্তন সবকিছু যেন বিশ্রী, বিস্বাদ করে দেয়। সে-যে ক্রমশই আনমনা হয়ে যাচ্ছে, চব্বিশ ঘণ্টা কী একটা দুশ্চিন্তায় অন্যমনস্ক, আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, এটা স্পষ্টই দেখতে পায় লিজা। কিন্তু...কেন? কী এমন দুর্ভাবনা...? ধরতে না পেরে লিজার মন আরো খারাপ হয়ে যায়।

ভার্ভারা আলেক্সিভনা কিছুদিন হল চলে গেছেন। মেরি পাভলোভনা অবশ্য বাড়িতেই আছেন। তিনি ঘর থেকে বড় একটা বাইরে বেরোন না। আর আছেন ইউজিনের সেই দূর-সম্পর্কের মামা—অতিথি হিসেবে।

দিন যেন আর কাটতে চায় না। ইউজিনের তখন সেই অর্ধোন্মাদ অবস্থা। মনটা অপ্রকৃতিস্থ। নিজের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়েছে। একলা-একলাই থাকতে চায় বেশিক্ষণ, মন গুমরে গুমরে বেড়ায়।

এমন সময়ে নামল বৃষ্টি। জুন মাসটায় এরকম প্রায়ই হয়ে থাকে। দুদিন ধরে ক্রমাগত বৃষ্টি আর মুহুর্মুহু বজ্রপাত। সে কী অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণ আর বিদ্যুতের চমকানি! পৃথিবী যেন ঝাপসা, সজল ধূম্রজালে আগাগোড়া মোড়া। সমস্ত কাজকর্ম আপনা থেকেই বন্ধ। কে আর বেরোবে এই দুর্যোগ মাথায় করে! ক্ষেত-খামারে কেউ আর হাজিরা দেয় না। জমিতে গাড়ি করে সার নিয়ে গিয়ে ফেলা হয় না। জন-মজুরের দল সেই নোংরা কাদার পাঁক ঘাঁটতে নারাজ। তারা সব ঘরে বসে, জমির দিকে ভিড়তে চায় না। চাষিরাও তাই, কুঁড়েঘরে আগল এঁটে বসে আছে।

আর রাখালদের নাকালের একশেষ! গরু-বাছুরগুলোকে এই বৃষ্টির মধ্যে তাড়িয়ে গোয়ালে ঢোকানো—সে এক প্রাণান্তকর ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত কোনোরকমে তাদের মাঠ থেকে ফিরিয়ে আনা হল। অন্য সব গরু-ভেড়া, যারা ঘরেই ছিল, তারাও ছিটকে বেরিয়ে পড়ল এই সুযোগে চরে খাবার জন্যে। মাঠে ছুটোছুটি শুরু করে দিল সব। চাষির বৌ-ঝিরা গায়ে একখানা করে পশমি চাদর জড়িয়ে নিয়ে খালি পায়ে জল-কাদার মধ্যেই ছুটন্ত গরু-বাছুরগুলোকে ধরবার জন্যে এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল। চারিদিকেই জল। মাঠে, ক্ষেতে, রাস্তায়—সর্বত্রই জলস্রোত।

www.BanglaBook.org

খানা-খোন্দল জলে ভরতি—নালা দিয়ে জল ছুটছে তীব্রবেগে। ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে ভাঙা ডালপালা, অজস্র খড়কুটো। বনে-বাগানেও সেই এক অবস্থা। ঢালু জমি বেয়ে নামছে জলের ধারা—যেন ছোট ছোট ঝরনা। সমস্ত পথঘাট ভিজে। পাতা আর ঘাসগুলোর নরম সবুজ রঙ পর্যন্ত বিবর্ণ হয়ে উঠেছে ক্রমাগত জলে ধুয়ে ধুয়ে।

ইউজিন ঘরেই বসেছিল। লিজাও ছিল বসে।

কিন্তু লিজার সঙ্গ আজ যেন ক্লান্তিকর লাগছিল ইউজিনের। রীতিমতো অপ্রীতিকর লাগছিল এই চুপচাপ বসে থাকা, নয়তো লিজার প্রশ্নের জবাব দেওয়া।

কী যেন হয়েছে আজকে লিজার। স্বামীর মনের অবস্থা দেখে তারও অস্বস্তি জাগে মনে। থেকে থেকে একই প্রশ্ন করে :

'কী হয়েছে বল তো, তোমার...'

'কিছু হয় নি...কী আবার হবে?' জবাব দেয় ইউজিন। কণ্ঠস্বরে বিরক্তির ঝাঁজ ফুটে ওঠে।

লিজা হাল ছেড়ে দেয়—আর কিছু জিজ্ঞাসা করে না। স্বামীর অসহিষ্ণুতায়, তার চিন্তাপীড়িত মুখের চেহারায় কষ্ট পায় লিজা। কিন্তু স্বামীকে প্রশ্ন করে সে আর উত্ত্যক্ত করতে চায় না। ইউজিনের মনঃকষ্টের অংশ সে যখন গ্রহণ করতে পারছে না—তখন বার বার একই কথা তুলে কোনো লাভ নেই। ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে লিজা। কিন্তু জোর করে নিজের মানসিক বিক্ষোভ নিজেই চেপে রাখে।

সকালবেলার খাওয়ার পর্ব শেষ হয়ে গেছে।

বসেছিল লিজা আর ইউজিন, ড্রয়িংরুমে। ইউজিনের সেই মামাও ছিলেন। ভদ্রলোক এত অজস্র বাজে কথাও বলতে পারেন! এই নিয়ে বোধ হয় একশো বার বললেন তাঁর বড় বড় আলাপীদের কথা। সমাজে, অভিজাত ঘরের, মস্তবড় লোকদের সঙ্গে তাঁর কীরকম ঘনিষ্ঠ আলাপ, কীরকম খাতির, সেই কথা যেন আর শেষ হতে চায় না। ইউজিন ও লিজা তাঁর এই কাল্পনিক কাহিনীগুলো বহুবারই শুনেছে এবং শুনে-শুনে তাদের কান পচে গেছে। এখন ওঁর কথায় তারা কেউ কান দেয় না।

লিজা অন্যমনস্কভাবে বুনে চলেছিল। বুনছিল একটা পশমের জামা। এক-এক সময়ে ভারি বিরক্ত লাগছিল তার। ক্রমাগত এই ঘ্যানর ঘ্যানর—টেনেবুনে রসিকতার প্রাণান্ত চেষ্টা—আর একই ধরনের পুরানো, সস্তা রসিকতা—মোটেই বরদাস্ত করা যায় না। কিন্তু কী আর করবে লিজা? পশমের ওপর ঝুঁকে পড়ে আনমনা হয়ে বুনতে থাকে। কখনো-বা সোজা হয়ে বসে চুপ করে থাকে—এদিক-ওদিক তাকায় আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। এক-আধটা টুকরো কথা বেরিয়ে আসে মুখ থেকে হয়ত—'কী বিশ্রী দিনটা আজ!' কিংবা 'পিঠের এই জায়গাটা কীরকম ব্যথা লাগছে, টনটন করছে মধ্যে-মধ্যে।' এ-যেন কথা বলতে হয়, তাই বলা।

মামা মুখের কথা লুফে নিয়ে বলে ওঠেন :

'তা হলে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়াই ভালো।'

নিজেও উঠে পড়েন সঙ্গে সঙ্গে। এদিক-ওদিক একটু ঘুরে এসে নিজের জন্যে ভদ্‌কার সন্ধান করেন। গলাটা শুকিয়ে উঠেছে—একটু ভিজিয়ে নেওয়া দরকার।

কী বিশ্রী আর বিস্বাদ লাগে এই বাড়ির আবহাওয়া। কোনো বৈচিত্র্য নেই, কোনো নতুনত্ব নেই। সেই এক কথা—খাওয়া আর বসা। ব্যস, ফুরিয়ে গেল দিনটা। ইউজিনের মনটা তিক্ততায় আর নৈরাশ্যে পাথরের মতো ভারি হয়ে ওঠে। একবার একখানা বই নিয়ে নাড়ে চাড়ে। সেটা ফেলে দিয়ে আবার একখানা ম্যাগাজিন টেনে নেয়। চোখ রেখে লেখার ওপর পড়বার চেষ্টা করে। এক বর্ণও ঢোকে না মাথায়। সব ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে পড়ে ইউজিন, মন বসাতে না পেরে। লিজার দিকে তাকিয়ে বলে :

'যাই, একবার ঘুরে দেখে আসি। বেরোতেই তো হবে। উখো দিয়ে ঘষবার নতুন মেশিনটা এসে পড়ে আছে কাল থেকে।'....

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলেই বারমুখো হয় ইউজিন। ঘরে বসে থাকা অসম্ভব।

পেছন থেকে লিজা বলে ওঠে : 'ছাতা নিয়ে বেরিয়ো কিন্তু'....

ইউজিন ততক্ষণ বারান্দায় গিয়ে পড়েছে। হেঁকে জবাব দেয় :

'নাহ্—ছাতার দরকার নেই! এখানে লেদার-কোট রয়েছে। তা ছাড়া, আমি তো বেশিদূর যাচ্ছি না—এই মেশিনঘর অবধি'....

পায়ে বুট-জোড়াটা গলিয়ে নেয় ইউজিন। গায়ে লেদার-কোট চড়িয়ে, বেরিয়ে পড়ে সাঁ করে কারখানার দিকে। তখনো বৃষ্টি চলছে, ছাটও আছে।

বিশ গজ রাস্তা যেতে-না-যেতেই দেখতে পায় ইউজিন—একটি স্ত্রীলোক আসছে তার দিকেই। জলের মধ্য দিয়েই ছলাৎ ছলাৎ করে হেঁটে আসছে। খালি পা। স্কার্টটা অনেকখানি উঁচুতে তোলা—প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। সুগঠিত শাদা পায়ের ডিম জলে ভিজে আরো যেন ধবধবে শাদা দেখাচ্ছে। মাথার ওপর থেকে কাঁধ ও পিঠ পর্যন্ত পশমি চাদরে ঢাকা। চাদরের দুইটি প্রান্ত একত্র করে এক মুঠোয় ধরা। বেশ গুটিগুটি, কুঁজো হয়ে জলের ছাট বাঁচিয়ে এগিয়ে আসছে....

'কোথায় চলেছ?' না চিনেই জিজ্ঞাসা করে ইউজিন। ভেবেছিল আর কেউ বুঝি।

মুখখানা ঠাহর হয় নি প্রথমটা। যখন ইউজিন চিনতে পারল তাকে, তখন আর উপায় নেই। প্রশ্ন বেরিয়ে গেছে মুখ থেকে..

'বাছুর হারিয়েছে। তাই খুঁজে মরছি...তা আপনি এই বৃষ্টিতে? যাচ্ছেন কোথায়?'

কথাগুলো এমন সহজ কণ্ঠে বলল স্টিপানিডা—যেন ইউজিনের সঙ্গে তার রোজই দেখা-সাক্ষাৎ কথাবার্তা হয়ে থাকে। বিস্ময়ের কোনো চমক নেই তাতে।

'ঐ ছাউনি-ঘরটায় এসো...' হঠাৎ বলে বসল ইউজিন। নিজেই বুঝতে পারে না সে, কেমন করে এমন কথা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল...আর কেনই বা সে দুম করে কথাটা বলে ফেলল।

নিজেকে সামলে নেবার সময় মেলে নি। আর কেউ যেন তার মুখ দিয়ে কথাটা বলিয়ে নিল।

থমকে দাঁড়িয়ে রইল স্টিপানিডা। হাসি-হাসি মুখে বেশ খানিকক্ষণ নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টিতে দেখে নেয় ইউজিনকে—তার মুখ আর সারা দেহখানা।

চাদরের একটা কোণ দাঁত দিয়ে খুঁটতে থাকে স্টিপানিডা। কী যেন ভাবছে ও...তারপর সহসা একটা কটাক্ষ হেনে দ্রুত পায়ে চলে যায় সোজাসুজি বাগানের পথ পেরিয়ে ছাউনি-ঘরের দিকে।

ইউজিন কিন্তু পিছুপিছু গেল না। যে-পথ ধরে আসছিল মাঠের ওপর দিয়ে সেই পথ দিয়েই চলতে শুরু করে আবার। ইচ্ছেটা এই যে, লাইল্যাক ঝোপের কাছ বরাবর গিয়ে বাঁ-হাতি সরু পথটা ধরে ছাউনি-ঘরে গিয়ে পৌঁছুবে। তবু খানিকটা ঘুর-পথ...

'হুজুর!'

পেছন থেকে কার গলার আওয়াজ শোনা গেল....

'হুজুর! গিন্নিমা ডাকছেন আপনাকে...কী জরুরি কাজ আছে। এক মিনিটের জন্যে একবার আসুন....'

ইউজিন ফিরে দাঁড়ায়। দেখে, তার বেয়ারা মিশিয়া...জলের ভেতর দিয়েই হাঁটছে জোরে জোরে মনিবকে ধরবার জন্যে।

অন্যমনস্ক, আবিষ্ট ভাবটা কেটে যায় ইউজিনের। বলে ওঠে :

'একেই বলে দৈব! এই নিয়ে দু-বার। দু-বারই তুমি আমায় বাঁচালে ভগবান!'

ইউজিন তক্ষুনি ফিরল।

মিশিয়ার সঙ্গে ফিরে এল বাড়িতে লিজার জরুরি ডাকে।

আসবামাত্রই লিজা ইউজিনকে স্মরণ করিয়ে দিল :

'সেই যে বুড়ি মেয়ে-মানুষটির অসুখ করেছে...তুমি বললে খাবার টেবিলে বসে, ওকে ওষুধ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাঠিয়ে দেবে! কথা দিয়েছ যখন—তখন দেওয়াই উচিত। সে হয়ত আশা করে আছে...বেরোচ্ছ যখন—তখন নিয়েই যাও না নিজে, সঙ্গে করে...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—ভুলে গিছলুম...' ইউজিন বলে ওঠে তাড়াতাড়ি।

দুজনে মিলে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ওষুধটা খুঁজে বার করে।

মিনিট পাঁচেক সময় এতেই বেরিয়ে যায়। তারপর ওষুধটা হাতে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ে ইউজিন।

কিন্তু সে মন আর নেই ইউজিনের। এখন জাগছে দ্বন্দ্ব আর সংশয়...সোজাসুজি ছাউনি-ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে পা যেন উঠতে চায় না—ভারি হয়ে আসে। এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে কী যেন একটা ঘটে গিয়েছে—যার ফলে, মনের মধ্যে দুনিয়ার সঙ্কোচ আর কুণ্ঠা এসে জড়ো হয়েছে...তা ছাড়া পিছন থেকে বাড়ির কেউ যদি দেখে ফেলে, আঁচ করে··· ? শুধু একটু একটু করে এগুতে থাকে ইউজিন, দ্বিধা-দুর্বল অর্ধগতিতে। তার পর বাড়িটা যখন অদৃশ্য হয়ে যায় বড় গাছগুলোর আড়ালে, ঝাঁ করে বাঁ-হাতি বাঁকা পথটা ধরে ইউজিন। তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করে উত্তেজনায়...শেষ পর্যন্ত পৌঁছয় ছাউনি-ঘরের আগলটার কাছে।

কল্পনা-নেত্রে স্পষ্ট যেন দেখতে পায় ইউজিন স্টিপানিডাকে। চোখের সামনে পরিষ্কার ভেসে ওঠে হাস্যমুখীর উজ্জ্বল, জীবন্ত ছবিখানা। ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে আছে বুঝি নীরব প্রতীক্ষায়, অপরূপ কৌতুকময় দৃষ্টি আর স্পন্দিত হৃদয় নিয়ে। আগলটা ঠেলে ব্যাকুল আগ্রহে ঢুকে পড়ে ইউজিন...

কেউ কোথাও নেই। স্টিপানিডা নেই ঘরের মধ্যে...

সে যে এসেছিল কিংবা এসে ফিরে গেছে—এমন কোনো চিহ্নই নেই ঘরে।

ইউজিন ভাবতে থাকে...

স্টিপানিডা যে এখানে আসে নি, সে তো স্পষ্টই দেখা এবং বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কেন? কী হল...?

হয়ত সে ইউজিনের কথা শুনতে পায়নি। এমনও হতে পারে, ইউজিন যে তাকে ছাউনি-ঘরে আসবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিল, সেটা ঠিক সে বুঝতে পারে নি। ইউজিন যেভাবে দাঁতে দাঁত চেপে অস্পষ্ট কণ্ঠে কথাটা বলেছিল, তাতে না শুনতে পাওয়ারই সম্ভাবনা বেশি।

কিন্তু স্টিপানিডা নিজেই হয়ত শেষ পর্যন্ত ইচ্ছে করে আসে নি। তার মত বদলেছে। দেহ-মনের কিংবা ইচ্ছার পরিবর্তন হওয়া কি এমনি অস্বাভাবিক? বিশেষ করে, মাঝখানে এত দিনের ব্যবধান।

'সত্যিই তো!' ইউজিন আবার ভাবে, 'আমার ভুল হয়েছে। আমারই বোঝবার ভুল...আমি বা কেন ভাবতে গেলুম যে, স্টিপানিডা আমাকে দেখেই ছুটে আসবে, ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার গায়ের ওপর...? এমনতর ভাবনার, অনুমান-প্রত্যাশার কি কোনো সঙ্গত কারণ আছে? মোটেই নেই...যেহেতু—প্রথম কথা, তার স্বামী রয়েছে বর্তমান, সুস্থ শরীরে, বহাল-তবিয়তে...আসলে আমি নিজেই মস্ত বড় বোকা, বোকারও অধম—পাষণ্ড। ঘরে রয়েছে ঘরণী—আর কত ভালো স্ত্রী সে—তবু ছুটছি আরেকজনের বৌয়ের পেছনে। চমৎকার বুদ্ধি আর রুচি আমার...!'

ছাউনি-ঘরের কোণে বেঞ্চিটায় বসে ইউজিন ভাবে নিজের কথা। নিজেকে বিশ্লেষণ করে নির্মমভাবে। নিরাশার ব্যর্থতা আর উত্তেজনার অবসন্ন শান্তি সেই আত্মচিন্তাকে যেন আরো তিক্ততায় ডুবিয়ে মারে।

বসে বসে ভাবে আর এদিক-ওদিক চোখ ফেরায় ইউজিন। দেখে ছাউনি-ঘরের চালে দু-একটা ফুটো। ফুটো বেয়ে খড়ো চাল থেকে জলের ফোঁটা টিপ-টিপ করে পড়ছে কাঠের মেঝের ওপর।

'কিন্তু কী ভালোই লাগত, যদি আসত স্টিপানিডা—আসত একলা এই বৃষ্টি মাথায় করে! কেউ কোথাও নেই—ফাঁকা মাঠে ঝাপসা বৃষ্টি আর অবিশ্রান্ত জোলো হাওয়া আর এই ছোট্ট কুঁড়ের মধ্যিখানে সে আর আমি—একলা। যদি আরেকবার ওকে পেতুম—বুকের মধ্যে বন্দি করে রাখতুম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওকে...ছাড়তুম না...তারপর যা হবার তা-ই হত—কিচ্ছু এসে যেত না। না, ছাড়তুম না...আমার বাহুবন্ধন থেকে মুক্তি পেত না স্টিপানিডা....'

বসে বসে ভাবে ইউজিন। একলা নির্জনে বসে সেই এক কথাই ভাবে। বাইরের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর অশান্ত আকাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ইউজিনের দুরন্ত কামনা হৃদয়ে দাপাদাপি শুরু করে দেয়...দেহ-মনকে ক্ষইয়ে দেওয়া সে দুর্বার কামনার অপার চিন্তা...শেষ নেই তার।

হঠাৎ মনে পড়ে যায় ইউজিনের...'তাইতো! বাইরে ঘাসের মাটিতে ওর পায়ের দাগ পড়েছে কি না দেখলেই বোঝা যায় সে এসেছিল কিংবা আসে নি।'

বাইরে বেরিয়ে এদিক-ওদিক তাকায় ইউজিন, কোনো নিশানা পাওয়া যায় কি না। ছাউনি-ঘরের চৌকাঠের বাইরে ভিজে স্যাঁৎসেঁতে মাটি আর ঘাসে আগাছায় ঢাকা-পড়ে-যাওয়া সরু সুঁড়িপথটা লক্ষ করে দেখে।

ঐ তো পরিষ্কার পদচিহ্ন, অনেকগুলো...পর-পর...শুধু পায়ের দাগ, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। এমনকি, যেখানটায় পিছলপথে পা হড়কে গিয়েছিল, সেখানেও একটা লম্বা টানা দাগ...

'এসেছিল তাহলে। ভুল হয় নি...আমার। আর তো সন্দেহের কারণ নেই। ভালোই হল...' ইউজিন মন স্থির করবার চেষ্টায় শরীরটা টান করে নেয়।

'একরকম ভালোই হল...হেস্তনেস্ত করা দরকার এবারে। স্টিপানিডার সঙ্গে এরপর যখন আবার দেখা হবে, তখন আর 'কিন্তু' করার কারণ থাকবে না—সোজা চলে যাব ওর কাছে...এ-আমার নিয়তি...নিয়তির অভ্রান্ত ইঙ্গিত..' ইউজিন আবার ভালো করে নজর করে ভিজে মাটির নরম বুকে পায়ের দাগগুলো।

তারপর মাথা নেড়ে আপন মনেই বলে ওঠে :

'হ্যাঁ—যাব ওর কাছে। যেতেই হবে। আজই—রাত্তির হলে...'

ফিরে যায় ইউজিন ছাউনি-ঘরের মধ্যে। চুপটি করে বসে থাকে অনেকক্ষণ, কোণের বেঞ্চির ওপর। রাজ্যের চিন্তা এসে ঢোকে মগজে।

ভেবে ভেবে, কল্পনায় ছবি এঁকে, আপন মনে বিড়বিড় করে বকে, ইউজিন ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়ে।

তারপর একসময় গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে। সব যেন ঝিমিয়ে আসে। খিন্ন দেহ, স্তিমিত আর নিস্তেজ মন নিয়ে ক্লান্ত পদক্ষেপে বাড়ির দিকে ফেরে ইউজিন।

হাতে এখনো ওষুধটা রয়েছে। বাড়ি ফিরবার আগে ওষুধটা সে দিয়ে আসে সেই বুড়ি মেয়ে-মানুষকে। এসেই সোজা চলে যায় নিজের ঘরে। ঘরে ঢুকে কৌচের ওপর অবসন্ন দেহটাকে এলিয়ে দেয়...চুপচাপ শুয়ে থাকে...অপেক্ষা করে ডিনারের সময়ের।

১৭

ডিনারের একটু আগে লিজা এসে ঢুকল ইউজিনের ঘরে। দেখে স্বামী শুয়ে আছে চুপচাপ। স্থির, নিস্পন্দ দেহ। অন্যমনস্ক।

লিজা ভেবেই পায় না, ইউজিনের মনে কী এত গভীর দুঃখ থাকতে পারে যার জন্যে দিনের পর দিন সে এমনি ধারা বদলে যাচ্ছে।

নিজে থেকেই এসে কথা পাড়ে লিজা, তোলে তার প্রসবের কথা।

'আমার মনে হচ্ছে তোমার বোধ হয় ইচ্ছে নেই যে আমি মস্কো যাই...আগে তো কথাই ছিল যে মস্কোয় বড় বড় ডাক্তার—ঐখানেই প্রসব হবে। এখন দেখছি তোমার তেমন গা নেই...তাই ঠিক করেছি—'

'কী?' ইউজিন এতক্ষণ বাদে সাড়া দেয়।

'মস্কো আমি যাব না—মানে, যাবার আর দরকার নেই। যা হবার বাড়িতেই হবে।'

ইউজিন ঠিক বুঝে নেয় লিজার মনের কথা। আসলে লিজার মনে রীতিমতো ভয় আছে প্রসব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ব্যাপার সম্পর্কে। সেটা অবিশ্যি খুবই স্বাভাবিক। তা ছাড়া, পাছে শিশু নিপুণ যত্ন এবং অভিজ্ঞ তত্ত্বাবধানের অভাবে যথেষ্ট স্বাস্থ্যবান না হয়, সে সম্বন্ধেও লিজার উদ্বেগ আছে। খুঁতখুঁতুনি বলাও চলে। তাই লিজা যখন বলে বসল সে মস্কোয় যাবে না, বাড়িতেই ছেলে হবে— তখন তার মনের যে-দ্বন্দ্ব চলেছে, সেটার গুরুত্ব অনুমান করা ইউজিনের পক্ষে খুব কঠিন হয় না। এক হিসেবে, এটা লিজার স্বার্থত্যাগ। ইউজিনের বর্তমানে যে-মানসিক অবস্থা, সেটা বুঝেই লিজা মস্কো যাত্রার সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দিতে চাইছে। এখন ইউজিনের মনস্তুষ্টির জন্যেই বাড়িতে থাকা দরকার, এটা লিজা বুঝেছে খুব স্পষ্টভাবেই। তাই মস্কো যেতে সে নারাজ। লিজার এই অনায়াস স্বার্থত্যাগে, নিশ্চেষ্ট আত্মদানে ইউজিন একরকম কষ্টই পায়। দুঃখ বোধ করে তার নিজের অযোগ্যতায়। প্রতিতুলনায় নিজেকে হেয়, অশ্রদ্ধেয় মনে হয়।

সত্যিই বাড়িতে তার সবকিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। চারদিকে কোথাও কোনো মালিন্যের স্পর্শ নেই। তার চিত্তবিনোদনের জন্যে লিজার আপ্রাণ চেষ্টা সবখানেই পরিস্ফুট। ঝকঝকে, তকতকে ঘরদোর। মনোরম ব্যবস্থা...বেশ একটা পবিত্রতার আমেজ।

আর যতকিছু গণ্ডগোল ইউজিনের মনে। তার নিজের চরিত্রে আর হৃদয়ে। মলিন, কলুষিত তার চিত্ত। পঙ্কিল, কদর্য তার মনোভাব—লালসায় সিক্ত, অপবিত্র, ঘৃণ্য।

সারা সন্ধ্যাটা কাটল বিশ্রীভাবে। আত্ম-বিচারে ধিক্কার আসে নিজের ওপর। মনের নির্যাতন আর সহ্য হয় না যেন। আর সবচেয়ে যেটা খারাপ লাগে ইউজিনের সেটা তার জ্ঞানকৃত পাপাচরণ—যেটা সে কোনোমতেই প্রতিরোধ করতে পারছে না নিজেরই মনের অসহায় দুর্বলতার জন্যে। ইউজিন ভালোভাবেই জানে এবং অনুমান করতে পারে—তাঁর আত্মশোচনা যতই আন্তরিক হোক, দুর্বলতার জন্যে আত্মধিক্কার ও ঘৃণা যতই তীব্র হোক, স্টিপানিডার প্রতি আসক্তি কাটাবার জন্যে যতই সে প্রাণপণ কঠিন প্রয়াস করুক—কিছুই হবে না। কাল আবার যে-কে-সেই। শুরু হবে আবার অসহ্য উত্তেজনা, উন্মাদক অনুভূতি। ভেসে যাবে তার পণ-প্রতিজ্ঞা...আবার ছুটবে সে স্টিপানিডার দর্শনমাত্রেই। এ-জন্যেই দুঃখ ও ঘৃণা হয় বেশি নিজের ওপর, কোনোমতেই ক্ষমা করতে পারে না নিজেকে। এ-দুর্বলতার কোনো কৈফিয়ত নেই....

ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে ইউজিন উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আপন মনেই বলে ওঠে :

'নাহ্, এ-অসম্ভব হয়ে উঠল। এ-ভাবে কখনোই বাঁচতে পারা যায় না। এখন এর উপায় কী? কোনও প্রতিকারই কি নেই? হায় ভগবান, এ কী সমস্যায় ফেললে! আমি এখন করি কী?'

বাইরে থেকে এমন সময় দরজায় ঠকঠক করে শব্দ হল। আওয়াজ শুনলেই বোঝা যায়, বাইরের অতিথি।

ইউজিন ঠিক বুঝতে পারল, এ মামামশায় না হয়ে যায় না।

'আসুন—ভেতরে আসুন', ভেতর থেকে ইউজিন বলে উঠল। চিন্তাসূত্র হঠাৎ ছিন্ন হয়ে যাওয়াতে ইউজিনের কণ্ঠস্বরে ঈষৎ অসহিষ্ণুতার আভাস।

মামামশায় ঘরে এলেন। বেশ গম্ভীর ভাব। মুখখানা দেখলে কোনো সন্দেহই থাকে না যে, তিনি কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা করবেন বলেই এসেছেন।

লিজার তরফ থেকে দৌত্য-কার্যেই তাঁর আগমন। স্বকল্পিত অভিভাবকত্বের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় বহন করার মধ্যে যে একটি গভীর আত্মপ্রসাদ আছে, তার সুস্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে তাঁর মুখে।

ইউজিন সেটা সহজেই অনুমান করে নিল।

'দেখো ইউজিন, তুমি এটা বুঝতে পারছ কিনা জানি না—তবে আমি তো বেশ ভালোভাবেই লক্ষ করছি এবং বুঝতেও পারছি যে, তোমার একটা বড় রকমের পরিবর্তন হয়েছে—' বলেই তিনি ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। যেন ঘরের আবহাওয়ার মধ্যেও তিনি সেই পরিবর্তন নিরীক্ষণ করতে পারছেন।

'...আর লিজাও, বেচারি ভালোমানুষ বড়—সেও রীতিমতো কষ্ট পাচ্ছে। অন্তত তাই তো আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মনে হয়...অর্থাৎ তোমার দুশ্চিন্তার আর মানসিক পরিবর্তনে সে যে উৎকণ্ঠিত, বিপন্ন হয়ে উঠেছে—আশা করি এটা তুমি নজর করেছ, মানে, বুঝতে পেরেছ। আমার তাই মনে হয়...তোমার কী মনে হয়, সেটা অবশ্য আমি ঠিক বলতে পারি না। তবে আমার মতে তোমার এখান থেকে কিছুদিনের জন্যে সরে যাওয়া উচিত অর্থাৎ তোমাদের দু-জনের মনোভাব যে-রকম আড়ষ্ট দেখছি—পরস্পর খোলাখুলি কথাবার্তা বলা যখন অসম্ভব, তখন এ-ভাবে ঝুল কাটাকাটি না করে তুমি দিন কয়েকের জন্যে অন্য কোথাও বরং ঘুরে এসো। অবিশ্যি—জমি-কারখানা এ-সমস্ত ছেড়ে যাওয়া তোমার পক্ষে খুবই অসুবিধের ব্যাপার। চাষবাস আর চিনির ব্যবসা তুমি বেশ ভালোভাবেই গোড়াপত্তন করেছ আর যত্ন নিয়ে বিলি-বন্দোবস্ত করে ব্যবসা গড়ে তুলেছ। এ-সবের ভার অন্য কারুর ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে কোথাও যাওয়া যে কঠিন ব্যাপার—তাও বুঝছি। কিন্তু কী করতে চাও—তুমিই বলো! তাই তোমায় পরামর্শ দিচ্ছি—আর সকলেই বলবে, এটা সুপরামর্শ যে, তুমি বেরিয়ে পড়ো। আর...'

একটু থেমে, চিন্তা করে ইউজিনের মামা বললেন :

'যদি যাও, তো ক্রাইমিয়া ঘুরে এসো। চমৎকার জল-হাওয়া আর স্বাস্থ্যটাও এ-সময়ে ভালো। ওখানে চমৎকার একটা পানাগার আছে—একবার যেয়ো সেখানে। দেখবে কী এলাহি ব্যাপার...আর পানীয় সম্বন্ধে শেষ কথা....মানে, মুখে বলে শেষ করা যায় না। যদি যাও তো আর দেরি কোরো না....ঠিক সময় হল এই...সেরা আঙুরের মরশুম...'

'মামা!' চকিত এবং ত্রস্ত-সুরে ইউজিন বলে ওঠে,—'মামা, একটা কথা বলতে চাই আপনাকে। গোপন কথা! অত্যন্ত গোপন...কাউকে না বলে চেপে রাখতে পারবেন?' কপালে হাত বুলিয়ে নেয় ইউজিন। আর্ত, পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে তার মুখ। একটু থেমে আবার বলে : 'ভয়ানক লজ্জার কথা কিন্তু...আমার নিজের পক্ষে গভীর গ্লানিকর—কথাটা গোপন রাখতে পারবেন তো?'

ইউজিনের মুখে-চোখে যে উদ্বেগ আর আগ্রহের ব্যাকুলতা, তাতে মামাও রীতিমতো হকচকিয়ে গেলেন।

তারপর একটু সামলে নিয়ে একগাল হেসে বললেন গদগদভাবে, 'কী যে বলো তার ঠিক নেই! আমার পেট থেকে কথা বেরোবে?'

'না, তাই বলছি—মামা। কিছু মনে করবেন না...এই ব্যাপারে আপনার কাছে থেকে আমি সাহায্য পেতে পারি। পেতে পারি নয়—সাহায্য ভিক্ষা করছি। আপনি আমায় এখনো বাঁচাতে পারেন...'

কথাগুলো বলে ফেলেই ইউজিনের মনে যেন তৃপ্তির আমেজ লাগে। মনোভাবটা তার এখন অদ্ভুত। যে-মামাকে সে নিতান্তই অপদার্থ ভাবে, যার প্রতি কোনোদিনই সে শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতে পারে নি, মদ্যপায়ী অকর্মণ্য আর বক্তৃতাবাজ বলে যার সঙ্গ বিরক্তিকর বলেই এ-যাবৎ ঠেকেছে ইউজিনের কাছে, তার সামনে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের গোপন রহস্য ফাঁস করে দেওয়া, আত্মাবমাননায় নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করা—এমন একটা মানুষের চোখে নতিস্বীকার করার মধ্যে যে একটা বিশেষ ধরনের গ্লানিমিশ্রিত আনন্দ আছে, সেই চিন্তাটাই এখন ইউজিনের মনে সাময়িক শান্তির প্রলেপ টেনে দেয়। আশ্চর্য!

ইউজিনের আত্মধিক্কার এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে না বললেই নয়। কিছু রেখে-ঢেকে সে বলবে না। দোষক্ষালনের বিন্দুমাত্র অপচেষ্টা না করে সে সম্পূর্ণরূপেই আত্মপ্রকাশ করবে মামার কাছে। কতখানি অমার্জনীয় তার পাপ আর কতখানি অপবিত্র তার সচেতন কামনা—সেটা উদ্ঘাটিত হয়ে যাক—খুলে যাক তার বাইরের ভদ্র মুখোশটা। কঠিন শাস্তির প্রয়োজন তার মনের—একেবারে নির্মম, ক্ষমাহীন....

মনের চাপা আনন্দে ফুলতে লাগলেন মামামশায়।

ইউজিনের পারিবারিক জীবনে যে একটা গভীর রহস্য আছে, তারই গন্ধে তাঁর নাসারন্ধ্র স্ফীত

www.BanglaBook.org

হয়ে উঠল। তার ওপর সেই রহস্যটা যে রীতিমতো গ্লানিকর—লজ্জার বস্তু, আর ইউজিন সে কথাটা জানাবার জন্যে তাকে ধরেছে, এখনি বলবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছে,—অধিকন্তু অপরের ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে তিনি যে একটু মোড়লি করবার সুযোগ পাবেন—এই চিন্তাতেই তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

বহু প্রত্যাশিত খবরটি শোনবার অধীর আগ্রহ কোনোমতে চেপে উদার এবং উদাস কণ্ঠে মামা বললেন : 'কী যে বল তুমি! তুমি তো জান, ইউজিন, আমি তোমায় কতটা আপন বলে ভাবি...কতখানি টান তোমার ওপর! মুখে অবিশ্যি কিছু...'

ইউজিন বাধা দিয়ে বলে ওঠে : 'প্রথমেই বলে রাখি—আমাকে সকলে যা ভাবে, আমি তা নই। আসলে আমি কৃতঘ্ন, নরাধম। আমার মতোন পাপিষ্ঠ খুব কমই আছে...'

'আহ্—ওসব বাজে কথা যেতে দাও! তুমি কী যেন বলতে চাইছিলে...?' মুখের ভাবে মনে হয়, তিনি যেন ভীষণ ব্যথিত হচ্ছেন...ইউজিনের আত্মনিন্দা যেন নিতান্তই অবান্তর। ওসব কথা শুনতে তাঁর ঘোর অরুচি।

'কী বলছেন—মামা আপনি? কৃতঘ্ন নরাধম নই আমি! তবে কে, বলুন? লিজার স্বামী আমি—লিজার মতোন স্ত্রী, ক-জনের ভাগ্যে জোটে—জানেন আপনি?' বলতে বলতে ইউজিন উত্তেজিত হয়ে পড়ে, গলার আওয়াজ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে—'লিজার সঙ্গে যে মিশেছে, যে ওকে একবার চিনেছে, সে-ই জানে কত মহৎ ওর অন্তঃকরণ—কত পবিত্র তার মন। এত উদার যার প্রেম, আমার মতোন লোকের ওপর যার এত প্রগাঢ় শ্রদ্ধা—তার স্বামী হয়ে আমি—হ্যাঁ আমিই—ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকের মতোন একটা চাষির ঘরের মেয়েমানুষের পেছনে ছুটছি—চাইছি তাকে লুব্ধদৃষ্টিতে...'

...'সে কী? এ তো আমার বিশ্বাসই হয় না...' মামা আর্তস্বরে বলেন। কণ্ঠে তাঁর অপার্থিব বিস্ময়। 'কেন তুমি এ-কাজ করতে চাও....?' সত্যি, এ অসম্ভব কথা ইউজিন। মানে, তুমি কি বলতে চাও, তুমি সত্যিই লিজার প্রতি সাংঘাতিক অন্যায় করে ফেলেছ...?'

'হ্যাঁ, একরকম তাই। কুৎসিত সম্পর্ক স্থাপনের মতোই অকথ্য পাপ করেছি আমি। শেষ ধাপে নেমে এসেছি—ঝাঁপ দিতেও প্রস্তুত। দিই নি যে কেন, তা জানি না নিজেই। তবে যেটুকু বাকি আছে, তার জন্য কোনো কৃতিত্ব নেই আমার। মানে...আমার ওপর সেটুকু নির্ভর করে নি। স্থান-কালের অভাব-অসুবিধা বলেই হয়ত বাধা পেয়েছিলুম...অবস্থান্তরে ঘটে ওঠে নি শেষ পর্যন্ত। কিন্তু আমার দেহ-মন তো তৈরিই ছিল, এখনো তৈরি আছে—উন্মুখ হয়ে আছে সমস্তক্ষণ! কী যে হতে পারত...আর বারুদে আগুন লেগে গেলে কী সাংঘাতিক অগ্নিকাণ্ড বেধে যেত—তা বলতে পারি না....'

'আচ্ছা—আচ্ছা হয়েছে! এখন বল তো আমায়, কী করে—'

'ব্যাপারটা হচ্ছে এই রকম : বিয়ের আগে একটা বোকামির কাজ করে ফেলেছিলুম। আমাদেরই এই গ্রামের একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক আমার হয়েছিল। মানে, কিছুদিনের জন্যে তার ওপর আমার ভারি নজর ও টান পড়েছিল। দু-জনের হামেশাই একত্র এসে মিলতুম—অবিশ্যি গোপনে—জঙ্গলে, নির্জন মাঠের মধ্যে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ চলত....'

মামার মুখ-চোখ এইবার বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আগ্রহভরে তিনি প্রশ্ন করলেন : 'আচ্ছা, মেয়েমানুষটি দেখতে-শুনতে কেমন? বেশ সুন্দর?'

ইউজিন আপন মনেই তার কাহিনী বলে যাচ্ছিল, অত্যন্ত গম্ভীরভাবে। হঠাৎ মামার এই লঘুচিত্ত, কৌতূহলী প্রশ্নে তার চমক ভাঙল। বিরক্তিতে তার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল...

কিন্তু উপায় কী? নাচতে নেমে আর ঘোমটা দেওয়া চলে না। নিজে থেকেই ইউজিন আত্মপ্রকাশ করেছে। অপরের সাহায্য আর উপদেশ তার কাছে এখন এতই মূল্যবান, প্রয়োজনীয় যে, বিরক্ত হলে চলবে না। নিজের কেলেঙ্কারি সবিস্তারে বলবার জন্যে প্রথমে কেউ তো তাকে সাধ্য-সাধনা করেনি! অতএব স্বাভাবিক বিরক্তিটুকু হজম করে নিতে হয় ইউজিনকে। ঈষৎ অসহিষ্ণু ভাবে হাত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নেড়ে কথাটা যেন উড়িয়ে দিতে চায়। কৌশলে মামার প্রশ্নোত্তর এড়িয়ে গিয়ে ইউজিন আবার তার কাহিনী শুরু করে :

'আমি অবিশ্যি এটাকে মোটেই গুরুতরভাবে নিই নি। অর্থাৎ আমাদের এই সম্পর্কটা যে নিতান্তই সাময়িক—মনে আমার এই ধারণাই ছিল। মাঝে-মিশেলে দু-জনের দেখাশুনো হয়—একটা জৈব আকর্ষণে দু-জনে গোপনে মিলিত হই, এই পর্যন্ত। শিগগিরই এই সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া দরকার—সেটা বুঝতুম। বেশি দিন এটার জের চলা উচিত নয়, তা হলেই মুশকিল। মনে মনে তাই আঁচ করে রেখেছিলুম, এটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যখন নয়—তখন স্ত্রীলোকটিকে বারণ করে দিলেই হবে, আর যেন সে না আসে...'

একটু থেমে আবার ইউজিন বলতে শুরু করল :

'বিয়ের আগে সব ভেঙে দিয়েছিলুম নিজ হাতে—যাতে পরবর্তী জীবনে কোনো গণ্ডগোল বা জটিলতার সৃষ্টি না হয়...'

বলতে বলতে ইউজিন নিজেই চমকে ওঠে নিজের কণ্ঠস্বরে। কেমন ধীরে—কেমন সংযতভাবে এখন সে নিজের অবস্থা বর্ণনা করে যাচ্ছে। কীরকম আশ্চর্য লাগে, যেন আর কেউ বলে যাচ্ছে...

'তারপর...একদিন কেমন করে জানি না...কেন যে আবার ওকে দেখলুম! সে ঠিক বোঝাতে পারব না আপনাকে...কী যে হয়ে গেল আমার...এক-এক সময়ে মনে হয় সব ভোজবাজি...জাদুমন্ত্রের সম্মোহনী শক্তিতে বিশ্বাস হয়—মনে হয় 'অস্তিত্ব' বলে কোনো জিনিস নেই...আমার সমস্ত সত্তা দুর্বল, অসহায় হয়ে গলিত হয়ে গেল। দেখলুম তাকে...আর দেখবামাত্রই কোথা থেকে এক জঘন্য কামনার বিষকীট এসে বাসা বাঁধল আমার গোপন অন্তস্তলে। কায়েম হয়ে বসল সেখানে...নড়বার নাম নেই...ধীরে ধীরে কুরে কুরে খেতে লাগল আমাকে...এখনো সে খাচ্ছে...আর সে কী অসহ্য যন্ত্রণা, অশান্তি...আমি কিছুই করতে পারি না।

'এক-এক সময়ে নিজেকে যাচ্ছেতাই ভাষায় গালাগাল দিই, মনকে চোখ রাঙাই—এ কী হচ্ছে! কিছুতেই কিছু হয় না...মনে মনে বুঝতুম ঠিকই, কী সাংঘাতিক হচ্ছে আমার এই কদর্য আচরণ—মানে যে-পথে পা বাড়িয়ে আছি, যে-কাজ করতে যাচ্ছি, তার পরিণতি কী ভয়াবহ রকমের কুৎসিত—সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণই সচেতন ছিলুম এবং আছিও। তবু, তবু বারে-বারেই, ঘুরে-ফিরে লোলুপ আগ্রহে আমি সেইদিকেই ছুটে চলেছি। সামলাতে পারছি না নিজেকে। এত দিন যে তার বেশি কিছু হয় নি, আবার সেই কুৎসিত দেহ-সম্পর্কে লিপ্ত হই নি, সেটা নিতান্তই দৈবানুগ্রহ। যে-কোনো মুহূর্তেই আমি তলিয়ে যেতে পারতুম—যাই নি ঘটনাচক্রে, ঈশ্বরের কৃপায়। এই কালই তো যাচ্ছিলুম তার কাছে। দুর্বার আকর্ষণে ছুটেছিলুম...একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যেত কালকে। হঠাৎ ফিরে এলুম—লিজা লোক দিয়ে আমায় ডেকে পাঠিয়েছিল....'

মামা অবাক হয়ে শুনছিলেন এতক্ষণ। এইবার বললেন :

'কী আশ্চর্য এই বৃষ্টির মধ্যে? তুমুল বৃষ্টি আর দুর্যোগ মাথায় করে?'

'হ্যাঁ—দুর্যোগের মধ্যেই বেরিয়ে পড়েছিলুম'—ক্লান্ত সুরে বলে ইউজিন। 'আর, এই মনের ঝড় সহ্য করবার মতো আমার শক্তিও নেই...বড় পরিশ্রান্ত আমি, নিত্য-নিয়ত এই নিজের সঙ্গে নিজে যুদ্ধ চালিয়ে হয়রান হয়ে পড়েছি—মামা! তাই মন স্থির করেছিলুম—আপনার কাছে এসে অকপটে সমস্ত কথা স্বীকার করব, আপনার সাহায্য প্রার্থনা করব। বলুন তো, মামা, কী করা যায় এখন...?'

'কী যে পরামর্শ তোমায় দিই তাই ভাবছি—' মামা সত্যিই এবারে গম্ভীর হয়ে কথা বলেন। 'তবে এটা ঠিক—নিজের জমিদারিতে বসে এইরকম কোনো ব্যাপারে জড়িত হয়ে পড়া শুধু অবাঞ্ছিত নয়, অন্যায়ও বলতে পার...সবাই জেনে ফেলবে...এসব কথা চাপাচুপি দিয়ে বন্ধ করা যায় না...ঠিক বেরিয়ে পড়বে। তখন? লিজার শরীর এখন যে কত দুর্বল তা তুমি জান, আমিও দেখছি...ওকে কোনোরকম আঘাত দেওয়া উচিত হবে না, ওকে বাঁচানো দরকার! এতখানি শক ও সহ্য করতে পারবে কি? তা হলে...কিন্তু আমি ভাবছি—নিজের জমিদারিতে গ্রামের মধ্যে এসব কেন? অন্য কোথাও...'

www.BanglaBook.org

ইউজিনের কানে কে যেন গরম সিসে ঢেলে দেয়।

মামার কথা শুনেও শুনতে পায় নি এমন ভান করে ইউজিন। কথা এড়িয়ে যাবার জন্যে, তার যেটা প্রধান বক্তব্য ছিল সেইটেই আবার টেনে আনে : 'হ্যাঁ, আমাকে বাঁচান আপনি—আমার হাত থেকেই আমাকে বাঁচান—এই ভিক্ষা চাইছি—নিজের কবলে নিজেই পড়ে গেছি—এখন কোনোমতে তা থেকে রেহাই পেলে বাঁচি। আর দেখুন...আজ না-হয় উদ্ধার পেলুম এ সঙ্কট থেকে, অভাবিত ঘটনার ফেরে বাধা পড়ে গেল। কিন্তু...কাল? না-হয় পরশু? কিংবা অন্য কোনো সময়ে—যখন বাধা দেবার কেউ থাকবে না—যখন আকস্মিক একটা ঘটনা এসে আমার কামনার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে না,—তখন? তখন কী হবে? আর তা ছাড়া...স্ত্রীলোকটি তো সব জানতে পেরেছে...বুঝতে পেরেছে আমার মনের অবস্থা। দোহাই আপনার—আমাকে একলা ছেড়ে দেবেন না,—আমি মারা পড়ব। বাঁচান আমাকে, যে-কোনো উপায়ে হোক বাঁচান!'

ইউজিনের কণ্ঠস্বরে যে-কাতরতা ফুটে ওঠে, তাতে বিপদের আশঙ্কা সম্বন্ধে মামার মনে কোনো সন্দেহই থাকে না। জিজ্ঞাসা করেন :

'আচ্ছা, সে হবে'খন। এখন কথার জবাব দাও দিকি—সত্যিই কি তুমি তাকে ভালোবাস—এত ভালোবাস যে, তাকে নইলে তোমার চলে না?'

'মোটেই না' —ইউজিন তাড়াতাড়ি বলে ওঠে। 'মোটেই তা নয়। আপনি যেভাবে দেখছেন, সেটা ভুল। ভালোবাসার কাঙাল হয়েছি বলে আমার এ দুরবস্থা হয় নি। হয়েছে অন্য কারণে। কোথা থেকে একটা অদৃশ্য শক্তি এসে আমাকে আঁকড়ে ধরেছে,—সে কী সাংঘাতিক মোহিনী শক্তি, তা বলতে পারি না। থেকে-থেকে আমার টুঁটি টিপে ধরছে। তা থেকে আমার নিস্তার নেই। সে শক্তির বিরুদ্ধে আমি কম যুদ্ধ করি নি। কিন্তু আমি ক্লান্ত, পরাস্ত। হার মেনেছি তার কাছে। মাথা তুলে দাঁড়াবার মতো মনের জোর আর আমার নেই। কী যে হয়েছে আমার, আমি কিছুই বুঝতে পারি না। কে যেন আমার দেহ-মনের সমস্ত বল শোষণ করে নিয়েছে। আমি জীর্ণ, অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে আছি। কেন আমার এমন হল! বলতে পারেন মামা? কী করি এখন? হয়ত ক্রমশ আবার সেই শক্তি আমি ফিরে পাব,—তখন রাহু-মুক্ত হয়ে এমন দুর্বল, অসহায় আর থাকব না—ওসব ঝেড়ে ফেলতে পারব—কী বলেন আপনি? আপনার কি মনে হয়—পারব না?'

মামা বলেন : 'যা বলছিলুম তোমায়, তাই কর। চল, একসঙ্গে ক্রাইমিয়া ঘুরে আসা যাক। তোমার মন ভালো হবে, স্বাস্থ্যও ফিরবে...কি বল?'

'রাজি আছি। আমি তো চলে যেতেই চাই...তবে আর দেরি নয়। আপনি সঙ্গে থাকবেন—ভালোই হল। কথায়-বার্তায় অন্যমনস্ক থাকব...অন্য চিন্তার অবকাশ থাকবে না....'

১৮

মনের মধ্যে যে-দ্বন্দ্ব আর অশান্তি প্রতি মুহূর্তে ইউজিনকে অতিষ্ঠ করে তুলছিল, তার জীবনকে বিষাক্ত করে দিচ্ছিল, তা থেকে কিছুটা যেন মুক্তি পেল সে এইবার। খানিকটা সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করবার মতোন মনের ধৈর্য আবার ফিরে এল।

ধীরস্থিরভাবে আবার যে ইউজিন কাজকর্ম করবার সামর্থ্য খুঁজে পেল—তার প্রধান কারণ হল, মনের কথা খোলসা করে আরেকজন মানুষের কাছে সে বলতে পেরেছে। মনের মধ্যে একটি বিষকীট গোপনে পালন করার যে-নিদারুণ অস্বস্তি আর যন্ত্রণা, তা ইউজিন ভালোভাবেই ভোগ করেছে। সে কথা কাউকে বলবার নয়, অথচ ঝেড়ে ফেলার নয়—দিনের পর দিন, যে-দুশ্চিন্তার বিষে দেহের প্রতিটি কোষ জর্জর হয়ে ওঠে, সে কথাটা যদি ভরসা করে, মনের সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করে দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে বলে ফেলা যায়, মন তখন খানিকটা আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পায় বৈ কি! মামার সঙ্গে মন খুলে কথাবার্তা কওয়ার ফলে ইউজিনের শরীরটাও যেন ঝরঝরে হয়ে ওঠে। শুধু কথা বলার জন্যে বা গ্লানিকর গোপন রহস্য-উদ্ঘাটনের জন্যে যে এই স্বচ্ছন্দ ভাবটা আসছে, ঠিক তা নয়। ভীষণ দুর্যোগ উপেক্ষা করে ইউজিন যখন স্টিপানিডার পিছু ধাওয়া করেছিল, যে দিন 'হয়

www.BanglaBook.org

এসপার, নয় ওসপার' ভেবে সে শেষ ধাপে নেমে এসেছিল ঝাঁপ দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে—সেইদিনের পর থেকে মনের মধ্যে অহরহ যে-বিবেকের দংশন চলছিল, চলছিল ক্রমাগত আত্মধিক্কারের পালা, সেই অপরিসীম গ্লানি আর লজ্জাবোধ তার উত্তপ্ত মস্তিষ্ককে অনেকখানি ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। কঠিন উপবাস পালনের পর বিহিত প্রায়শ্চিত্তের পর চিত্তে নামে যে সংযমশুদ্ধ অবসন্ন প্রশান্তি, এ-যেন অনেকটা তাই।

ঠিক হল যে, ইউজিন আর তার মামা—দু-জনে ইয়ালটা যাত্রা করবেন, হপ্তাখানেকের মধ্যে।

যাবার আগে অনেক হাঙ্গামা। যাব বললেই চট করে বেরিয়ে পড়া যায় না—যদি থাকে পিছুটান। জমিজমা, কারখানা, ব্যবসা, বাড়িঘর তদারকের জন্যে ব্যবস্থার প্রয়োজন। ইউজিন কিছুদিনের জন্যে অনুপস্থিত থাকবে। তার অবর্তমানে যা-কিছু করণীয়—যা-কিছু দরকার হতে পারে, তার সমস্ত বন্দোবস্তই করতে হল ইউজিনকে। বিদেশে যেতে হলে টাকা তোলা দরকার। ইউজিনকে যেতে হল শহরে। তারপর বিষয়-আশয়ের ব্যাপার, ঝামেলা অনেক। তার যথারীতি তত্ত্বাবধানের জন্যে বাড়িতে আর কাছারিতেও সবিশেষ নির্দেশ দিতে হল বার বার।

সময়টা কাটল মন্দ নয়। সাংসারিক কাজে, বৈষয়িক পরামর্শে আর আত্মরক্ষার জন্য বিদেশ-যাত্রার বন্দোবস্তে দিনগুলো কেটে গেল তাড়াতাড়ি। আবার—অনেক, অনেক দিন পরে ইউজিন তার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা আর স্ফূর্তি ফিরে পেল। স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার হল হৃদ্য এবং আন্তরিক। লিজার সঙ্গে কথাবার্তায় আর সেই বিরক্তিকর অসহিষ্ণুতা কিংবা অকারণ উত্তেজনা হয় না। নৈতিক শৈথিল্যটুকু কেটে গিয়ে মনে আসে নবজাগরণের জোয়ার....তার মৃদু কলোচ্ছ্বাস শুনতে পায় ইউজিন...হৃদয়-মন স্নিগ্ধ, আর্দ্র হয়ে ওঠে নতুন আশায়, আত্মবিশ্বাসে....।

তাই সেই বৃষ্টির পর থেকে স্টিপানিডার সঙ্গে ইউজিন আর একবারও সাক্ষাৎ করল না। সস্ত্রীক বেরিয়ে পড়ল সফরে, চলে গেল ক্রিমিয়ায়।

সেখানে দু-মাস কাটাল ইউজিন। লিজার সংসর্গে, আনন্দে আর স্বস্তিতে এই দুটি মাস যেন মধু-যামিনী...লঘুপক্ষ দিনগুলো কোথা দিয়ে কেমন করে উড়ে যায়, ইউজিন ঠাহর পায় না। অনির্বেদ, গ্লানিশূন্য মনে সে চারদিকে তাকায়, দেখে কত নতুন জিনিস, নতুন মানুষ, নতুন দৃশ্য! বাইরের অপরিচিত দৃশ্য-জগৎ মনে তার অজস্র রঙ আর নতুন ছাপ ফেলে যায়। মুছে দেয় পুরাতন গ্লানি আর দুশ্চিন্তা। আকাশ-বাতাসের স্বাস্থ্যকর সবল মার্জনায় দেহ-মন শুদ্ধ স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। মনের ভিতরটা পর্যন্ত এমন পরিষ্কার, ঝকঝকে হয়ে ওঠে যে, ইউজিনের মনে হয়, সাম্প্রতিক অতীতের বিভীষিকা, বিষ-স্মৃতি সব ধুয়েমুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই সেদিনের দুশ্চিন্তা, মানসিক যন্ত্রণা যেন বহুযুগ-বিস্মৃত ঘটনা, বুঝি আর কারুর জীবনে ঘটেছিল। ইউজিন এখন যেন স্বতন্ত্র মানুষ, আত্মস্থ...নিরাসক্ত।

ক্রিমিয়াতে ওদের অনেকের সঙ্গে দেখা হল। যারা পুরানো আলাপী, তাদের সঙ্গে পরিচয়টা আবার নতুন করে ঝালিয়ে নেওয়া গেল। জমে উঠল ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। আবার অনেকের সঙ্গে নতুন চেনাশুনা হল। এইসব চেনা-পরিচয়ের ফলে, নতুন আর পুরানো বন্ধুদের নিয়ে লিজার ও ইউজিনের প্রবাস-জীবনের দিনগুলো কাটতে লাগল বেশ আরামে আর আনন্দে। জীবনটা যেন একটানা ছুটি—কোনো দায়িত্ব নেই, কোনো দুশ্চিন্তা নেই। কৈফিয়ত দেবার মতো কেউ নেই, নিজের মনের কাছে হুমকি খাওয়ার ভয় নেই। তা ছাড়া প্রবাসে এসে ইউজিন অনেক কিছু দেখল আর শিখল।

ক্রিমিয়াতে থাকতে ইউজিনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তাদেরই অঞ্চলের একজন বিখ্যাত পদস্থ কর্মচারীর। অভিজাত, সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক—তাঁর পদবি হল 'মার্শাল অব দি নোবিলিটি'। তাঁর সঙ্গে ইউজিনের সদ্ভাব অল্পদিনের মধ্যেই জমে উঠল। খাসা মানুষটি। বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত। উদারনৈতিক মত আর মনের প্রসার আছে বলেই ইউজিন তাঁকে হৃদ্যতার সঙ্গে গ্রহণ করল। ভদ্রলোক নিজেও বেশ অমায়িক। আভিজাত্য এবং উচ্চপদের দম্ভ তাঁকে একটি কঠিন সরকারি বস্তুপিণ্ডে পরিণত করতে পারে নি। ইউজিনের সঙ্গে আলাপ হওয়ামাত্রই তিনি বুঝেছিলেন—এই

www.BanglaBook.org

রকম লোকই কাজের হয়। কর্মনিষ্ঠ, দায়িত্ববোধসম্পন্ন এবং বুদ্ধিমান—এইরকম মানুষই তিনি পছন্দ করেন তাঁর পার্টির কাজের জন্যে। তাই তিনিও উৎসাহভরে ইউজিনকে কাছে টানলেন, তালিম দিতে লাগলেন তাকে পার্টিতে ঢোকাবার জন্যে। ইউজিনের সামনেও একটা ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশা পরিস্ফুট হয়ে দাঁড়াল। এমন একজন রাজপুরুষ—রাজনীতির ক্ষেত্রে যাঁর প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি অনেকখানি—তাঁর শিক্ষায়, সহৃদয়তায় এবং আনুকূল্যে ইউজিনও হয়ত পলিটিক্স-ক্ষেত্রে প্রবেশ করে নিজের আসন তৈরি করে নিতে পারবে।

আগস্ট মাসের শেষাশেষি লিজার একটি কন্যা-সন্তান ভূমিষ্ঠ হল।

চমৎকার ফুটফুটে, সুন্দর এবং স্বাস্থ্যবান শিশু। মনের মধ্যে যে-বিপদ আর ভয়ের আশঙ্কা ছিল—তার কিছুই হল না সৌভাগ্যক্রমে। গতবারে, প্রথম সন্তানটি গর্ভাবস্থায় নষ্ট হয়ে যাবার ফলে, সবাই যেমন এবারে সন্ত্রস্ত হয়েছিল, ডাক্তারি পরামর্শ আর সযত্ন পরিচর্যায় লিজাকে যেমন করে ঘিরে রাখা হয়েছিল, তার তুলনায় অত্যন্ত সুখ-প্রসব বলতে হবে বৈকি। প্রসবের সময়ে লিজার বিশেষ কোনো কষ্ট হয় নি। ইউজিনকেও তেমন কিছু ঝামেলা পোহাতে হয় নি। সহজ, সুস্থ এবং স্বাভাবিকভাবেই এল লিজার মাতৃত্ব।

সেপ্টেম্বর মাসে ওরা সবাই দেশে ফিরল। চারজনই একসঙ্গে। লিজা, ইউজিন, সদ্যোজাত শিশু-কন্যা আর ধাত্রী। ধাত্রীর প্রয়োজন হয়েছিল নবজাত শিশুকে স্তন্যদানের জন্যে। লিজার বুকে দুধ হল না তেমন। তাই বাচ্চাটিকে লালন-পালন করবার জন্যে ধাত্রী নিযুক্ত করতে হল।

ইউজিন বাড়ি ফিরল—একেবারে নতুন, স্বতন্ত্র মানুষ হয়ে। মনে তার সুখ ও স্ফূর্তি। অনভ্যস্ত পিতৃত্বের নতুন উত্তেজনা আর ভবিষ্যতের জীবনকল্পনায় একটা সচেতন, আশান্বিত মনোভাব—এ দুয়ের মাঝখানে তার পুরানো জীবনের যা-কিছু দুর্ভাবনা, মালিন্য অপসারিত হয়ে গেল। তন্দ্রাশেষে দারুণতম দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা যেমন মন হালকাভাবে নেয়, ভয়কে জয় করে জাগ্রত সত্তার বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশে—ইউজিনও তেমনি ভুলে যায় অতীত জীবনের ভয়াবহ গ্লানি। মোহমুক্ত দেহ-মন নবীন চেতনার আশ্বাসে, বর্তমান পরিবর্তনের অকাট্য প্রমাণে উল্লসিত উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। ছায়াগ্রাহী, প্রলাপসঞ্চারি, বিকৃত মনের দ্বন্দ্ব-নির্যাতন অন্তিম যবনিকায় অন্তর্হিত হয়ে যায়। নবজীবনের পাদপীঠে স্পন্দিত হতে থাকে সুস্থ প্রশান্তির আলোকছন্দ।

লিজার দুর্বল, কৃশকায় মূর্তি ইউজিনের মনে অজস্র প্রীতি-করুণার সঞ্চার করে।

সন্তান-সম্ভাবিতা স্ত্রী প্রসবকালীন সে-গুরুবেদনা সহ্য করে নীরবে, পত্নী-বৎসল স্বামী তার অনেকখানি অংশগ্রহণ করে, মনে-মনে সে যাতনা ভোগ করে আর হৃদয় পূর্ণ হয়ে ওঠে সমবেদনায়, নতুন ধরনের ভালোবাসায়। লিজার মুখে যে-পাণ্ডুর ক্লান্তির স্পর্শ রয়েছে এখনো, ইউজিন সেটা লক্ষ করে আর তার সমস্ত অন্তর অসীম স্নেহরসে সিঞ্চিত হয়ে ওঠে।

শিশুটির ওপর ইউজিনের অবিশ্যি এখনো তেমন মমত্ববোধ জন্মায় নি, জন্মাবার কথাও নয়। তবে তাকে কোলে নিয়ে ইউজিনের কেমন যেন একটা নতুন ভাব আসে মনে—বেশ একটা প্রীতিকর কৌতুকের আমেজ। খুদে-খুদে হাত-পা মেলে বাচ্চা যখন কোলে শুয়ে নড়াচড়া করে, তখন ভারি মজা আর স্ফূর্তি লাগে—অনেকটা সুড়সুড়ি লাগার মতোন। মনে হয়—কী অদ্ভুত!

জমিদারি আর বিষয়-আশয় ছাড়া নতুন আর একটা আকর্ষণ এল ইউজিনের জীবনে। ক্রিমিয়াতে থাকতে প্রাদেশিক অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দুমশিনের সঙ্গে আলাপ হওয়ার ফলে ইউজিনের মনে একটা নতুন আশা ও উদ্যম সঞ্চারিত হল। প্রবাসে মার্শালের সংস্রবে এসে, তাঁর কাছে কিছুটা তালিম নিয়ে ইউজিনের ধারণা জন্মালো যে, পাদরি ও জমিদারদের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত, প্রাদেশিক সদস্য-সভা জেমস্তভোতে তার প্রবেশ করা উচিত।

এর মূলে ছিল—কিছুটা কর্তব্য-প্রীতি ও সামাজিক দায়িত্ববোধ আর কিছুটা উচ্চাশা—ভবিষ্যৎ স্বপ্ন। মার্শালের সঙ্গে কথাবার্তা, পরামর্শ করে স্থির হয়েছিল যে, ইউজিন 'জেমস্তভো'র আসনপ্রার্থী হয়ে দাঁড়ালে, অক্টোবর মাসেই সেই প্রাদেশিক সভার বিশিষ্ট অধিবেশনে তাকে সদস্য-পদে নির্বাচিত

www.BanglaBook.org

করা হবে।

তাই দেশে ফিরেই ইউজিন তোড়জোড় শুরু করল। প্রথমে একদিন গেল শহরে; তারপর আর-একদিন গেল দুমশিনের সঙ্গে দেখা করতে। মাঝে মাত্র মাসখানেক সময়। ইতিমধ্যে অনেক কিছু ব্যবস্থা করতে হবে ইউজিনকে। নির্বাচনের পূর্বে তাকে সমাজে আর-একটু মিশতে হবে, শহরে এসে স্থানীয় সদস্যদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে। দুমশিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তো রাখতে হবেই—তিনিই যখন ইউজিনের মুরুব্বি।

কিছুকাল পূর্বেও যে-দুর্দম প্রলোভন তাকে কবলিত করেছিল, তার কথা ভুলে গেছে ইউজিন। বিশ্রী দুঃস্বপ্নের শ্বাসরোধকারী বিভীষিকা—মনের ওপর অসীম নির্যাতন, অন্তর্দ্বন্দ্ব, অনুশোচনা—এ-সমস্ত কথা যেন ভাবতেই ভুলে গেছে ইউজিন। যেন তারা বহুদিনের ধূসর স্মৃতি—কষ্ট করে স্মরণ করতে হয়। যেন কিছুদিনের জন্যে সে পাগল হয় গিয়েছিল সাংঘাতিকভাবে। অতি কষ্টে পার হয়ে এসেছে সেই ভীতিকর উন্মাদনা। দেহমনের ক্ষতচিহ্নগুলো মিলিয়ে এসেছে। সাময়িক উন্মত্ততার অপ্রীতিকর স্মৃতি অস্পষ্ট, লুপ্তপ্রায়...।

ইউজিনের মনে হয়—এতদিনে সে পুরোপুরি রাহু-মুক্ত হতে পেরেছে। অন্তত সে তাই ভাবে। বিগত জীবনের সেই খণ্ড-প্রলয়-যুগকে এখন সে বেশ উদাসীন, নির্বিকারভাবে দেখতে পারে।

তাই ইউজিন যেদিন প্রথম সরকার মশায়ের সঙ্গে একলা কথা বলবার সুযোগ পেল, সেদিন তার খোঁজখবর করতে মন একটুও কাঁপল না। এই প্রসঙ্গ আগে একবার ইউজিন আলোচনা করেছিল ভ্যাসিলি নিকোলাইচের সঙ্গে। তাই এখন সে-প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে গিয়ে তার কোনো লজ্জা-সঙ্কোচ হল না। বেশ সহজ, স্বাভাবিক কণ্ঠেই ইউজিন প্রশ্ন করল : 'তারপর...কী খবর? সিদর পেশনিকভ কি এখনো গ্রামে ফেরে নি...বাইরে-বাইরেই থাকে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—সে তো শহরেই রয়েছে...'

'আর তার বৌ... ?'

'তার কথা আর বলবেন না, হুজুর....' ভ্যাসিলি মুখখানা বিকৃত করে মনিবের প্রশ্নের জবাব দেয়। 'জঘন্য স্ত্রীলোক...ভারি নীচ প্রবৃত্তি ওর। এখন ঐ চাষি ছোঁড়াটা, জিনোভির সঙ্গে চালাচ্ছে...একেবারেই জাহান্নামে গেছে হুজুর।'

'হুঁ। তাহলে তো ঠিকই হয়েছে।' ইউজিন ভাবে। মনে-মনে নিজের তারিফ করে আর বলে : 'কী আশ্চর্য! এখন ওর কথায় মনে আমার লেশমাত্র দাগই পড়ে না। কী করছে কেমন আছে—এল কি গেল, কিছুতেই কিছু এসে যায় না...বিন্দুমাত্র কৌতূহলও হয় না আমার...সত্যি, কেমন আশ্চর্য বদলে গেছি!'

১৯

ইউজিন যা-যা চেয়েছিল, সবই সে পেয়েছে।

তার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে। দেনার দায় থেকে বাঁচিয়ে তালুকটা এখন তারই। সম্পত্তি সে রক্ষা করতে পেরেছে।

আর অন্যান্য বিষয়-আশয়... ? সব দিকেই তার সুরাহা। যে-কারখানা বসিয়েছে, সেটা তো ভালোমতেই চলছে। বিট-এর ফসল এবার উঠছে প্রচুর। চালু কারখানা আর অজস্র ফসল...এতে মোটা রকমের মুনাফা না হয়ে যায় না। বাৎসরিক আয়ের অঙ্কটা, ইউজিন মনে-মনে হিসেব করে দেখে, এবারে যথেষ্টই দাঁড়াবে।

তারপর...সন্তান লাভ হয়েছে তার অদৃষ্টে। শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে নির্বিঘ্নে। প্রসবের সময় কোনো কষ্ট পেতে হয় নি লিজাকে, সেটাও কম কথা নয়। মনের মধ্যে যা আতঙ্ক ছিল ইউজিনের... ! শাশুড়ি ঠাকরুন চলে গেছেন নিজের বাড়ি, কোনো উৎপাত নেই আর। আর সবচেয়ে বড় কথা—ইউজিন জেমস্তভো-সভায় নির্বাচিত হয়েছে, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। সকলেই তার তরফে ভোট দিয়েছেন। নতুন জীবনের নিশ্চিত আরামে কৃতিত্বের আস্বাদে ইউজিনের দিনগুলি নিটোল হয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওঠে। রুচির অর্থময় জীবন...সেখানে আশা ও উদ্যমে অনেকখানি অতীতের বিভীষিকা অপসৃত হয়ে গেছে, কোথাও কোনো ছায়া ঘনীভূত হয়ে ওঠে না। নিজের ওপর আবার আস্থা ফিরে আসে, আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রত্যয় জাগে ইউজিনের মনে...।

নির্বাচনের পর্ব চুকে গেছে। ইউজিন বাড়ি ফিরছিল শহর থেকে।

প্রাদেশিক–সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হওয়ায় বহু লোকই তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। তাই শহরের বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বাড়ি গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞতা জানানো প্রয়োজন। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পালা শেষ করতে গিয়ে ইউজিন এক জায়গায় ডিনার খেয়েছে আর উপর্যুপরি পাঁচ গ্লাস শ্যাম্পেন গলাধঃকরণ করেছে।

গাড়ি হাঁকিয়ে ঘরে ফিরছিল ইউজিন। মনটা বেশ প্রফুল্ল, দিলদরিয়া ভাব। উদার তৃপ্তির প্রসন্ন মুহূর্তে সবকিছুই তার ভালো লাগছে এখন। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানাবিধ জল্পনা–কল্পনা মনে উদয় হচ্ছে। চিত্তপটে রঙিন ইন্দ্রধনু। রাশ আলগা করে, ঠেসান দিয়ে বসে ইউজিন উপভোগ করে ঝিরঝিরে পাতলা নেশাটুকু। চোখের পাতায় নামে বর্ণাঢ্য বিলাসিতার আমেজ।

এ যেন দেশোয়ালি গ্রীষ্ম নয়, প্রাচ্য দেশের উত্তাপ। চমৎকার রাস্তা। প্রশস্ত ফিতের মতোন সামনে ছড়িয়ে যাচ্ছে, গাড়ি চলেছে গড়গড়িয়ে।

সূর্যের তাপ এইবার প্রখর হয়ে উঠল। রাস্তার ধুলো খরদাহে তপ্ত, চিক্কণ।

বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে ইউজিন।

ভাবছিল নিজের কথাই—অদূর ভবিষ্যতের কথা। নির্বাচন আর ভোট কুড়োবার পালা তো শেষ হয়েছে। এখন সে 'জেমস্তভো'র সদস্য। সে অঞ্চলের মনোনীত প্রতিভূ। এরপর কাজ কী...? দেশের দশজনের সামনে যে–উঁচু আসন, সাধারণ্যে যে–প্রতিষ্ঠা ছিল তার কাম্য স্বপ্ন, সেটা তো এখন সফল হতে চলেছে। এইবার শুরু হবে কাজ—সত্যিকারের কাজ। দেশের ও দশের সেবা।

কীভাবে সে আত্মনিয়োগ করবে দেশের ও সমাজকৃত্যে, সেই কথাই চিন্তা করে ইউজিন বার বার। সমাজের কাজে সে নিজেকে লাগাতে পারে, মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারে উৎপাদনের সাহায্যে—যার ফলে অনেক লোক কাজ পাবে, পাবে অন্নসংস্থান। তাতে করে ইউজিনের খাতির বাড়বে, স্থানীয় মানপ্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

যদি দিনকাল এমনিধারা থাকে, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে হুকমাফিক জীবনযাত্রা নির্দিষ্ট পথে এগুতে থাকবে। কল্পনায় অনুমান করে নেয় ইউজিন—আর বছর তিন–চার বাদে তার নিজের ও এই অঞ্চলের কৃষক–শ্রমিকের দল তাকে কী চোখে দেখবে। কীরকম সম্ভ্রম–ভরা দৃষ্টিতে প্রত্যাশায় ইউজিনের দিকে তাকাবে। যেমন ঐ বড় লোকটি...

ইউজিনের গাড়ি গ্রামের মাঝ–রাস্তা ধরে বাড়ির দিকে চলেছে। ঠিক সেইসময়ে একজন বৃদ্ধ চাষি আর একজন স্ত্রীলোক, দু–জনে মিলে একটা মস্ত বড় জলের টব হাত–ধরাধরি করে রাস্তা পার হচ্ছিল। লাগামটা একটু টেনে ধরল ইউজিন। ওরাও পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল রাস্তার ধারে।

পথ দেবার জন্যে ওরা যখন কাত হয়ে দাঁড়াল গা–ঘেঁষাঘেঁষি করে, আড়চোখে একবার দেখে নিল ইউজিন। এ যে চেনা মুখ! বৃদ্ধ পেশনিকভ আর তার পুত্রবধূ স্টিপানিডা। দেখামাত্রই চিনতে পারে ইউজিন। কিন্তু কী আশ্চর্য—দেখে একটুও আলোড়ন জাগল না মনে। স্টিপানিডার সঙ্গে দৃষ্টি–বিনিময় হল। তবুও এতটুকু চাঞ্চল্য অনুভব হল না। কথাটা ভেবে তৃপ্ত, আশ্বস্ত বোধ করে ইউজিন। বেশ শান্ত, স্থিরভাবেই তো তার দিকে চাইতে পেরেছে। চেহারা তেমনি সুশ্রী আছে...দেহের বাঁধন একটুও শিথিল হয় নি। কিন্তু তাতে ইউজিনের কিছু এসে যায় না...স্টিপানিডার অটুট রূপ–সৌন্দর্য সম্পর্কে সে সম্পূর্ণই নির্বিকার। কোনো কিছুই আর ইউজিনকে স্পর্শ করতে পারে না।

বাড়ির খিলান–দেওয়া ফটক পেরিয়ে প্রাঙ্গণে গাড়ি–বারান্দার কাছে এসে গাড়ি থামল।

মামা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। বললেন :

'কী খবর? কেল্লা ফতে...? অভিনন্দন জানাব নাকি?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ...খবর ভালোই,' ইউজিন জবাব দিল। 'নির্বাচিত হয়েছি, মামা....'

'বাহ্—কী চমৎকার! এত আনন্দ হচ্ছে আমার...এই সুখবর শুনে। আগে থেকে জানতুম অবিশ্যি—তোমার জয় হবেই। তবু তোমার স্বাস্থ্যপান করা দরকার—মানে, এখুনি...এমন একটা সৌভাগ্য-সংবাদের একটা বিশেষ ধরনের উৎসব প্রয়োজন...কিছু পানীয়...'

উত্তেজিত হয়ে পড়ে মামামশায় কথার খেই হারিয়ে ফেলেন।

মাঝে দিনকয়েক ইলেকশন নিয়ে ইউজিন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। ক্ষেত-খামারের কাজে মনোযোগ দেবার মতো সময় ছিল না।

এখন ও-পর্ব চুকে গিয়েছে। কৃতকার্য ইউজিন এবারে জমিজমার তদারক শুরু করে। বকেয়া কাজের ফ্যাসাদ অনেক। আর অনর্থক দেরি বা অবহেলা করা উচিত নয়।

একটু দূরেই কাজ হচ্ছে। বারদিকে ঐ গোলাবাড়িতে একটা নতুন ফসল-ঝাড়াইয়ের কল বসানো হয়েছে। কাজ চলছে পুরোদমে।

মজুরেরা খাটছে কেমন, দেখবার জন্য একটু করে এগিয়ে যায় ইউজিন...কাজ তদারক করতে করতে একসময়ে মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে গিয়ে পড়ে। এদিকটায় স্ত্রীলোকের দল...ইউজিন তাদের দেখেও দেখে না। চেষ্টা করে যেন চোখাচোখি না হয়ে যায়...।

তবু যত চেষ্টাই করুক ইউজিন, চোখ চলে যায় বারে বারে একই জায়গায়। ঘুরে-ফিরে তার শ্যেনদৃষ্টি গিয়ে নিবদ্ধ হয় একটি সুডৌল মুখের ছাঁদে। রাশীকৃত খড় অনায়াসে দু-হাতে তুলে নিয়ে ওদিকে সরিয়ে রাখছে। আর শুকনো খড়ের আঁটিগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে ঘোর লাল রঙের রেশমি রুমাল। আয়ত পাতার নিচে ঘন কালো চোখ। ইউজিনের বেত্রাহত শরীর আবার যেন টনটনিয়ে ওঠে....

দু-একবার দেখে নেয় ইউজিন আড়চোখে। অপাঙ্গদৃষ্টিতে কেমন যেন সব ঝাপসা ঠেকে। ইউজিন বুঝতে পারে তার শরীরে আর মনে কী একটা ঘটছে...কিন্তু কেন আর কিসের প্রক্রিয়া চলছে, সেটা ঠিক ধরতে পারে না। নিজের বোধশক্তি নিজেরই কাছে ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসে।

পরের দিন ইউজিন আবার গেল মাঠে। সেখানে কিছুক্ষণ থেকে গেল গোলাঘরের দিকে। আজও ফসল ঝাড়াই হচ্ছে...এমন কিছু তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন ছিল না, তবু ইউজিন ছুতোয়-নাতায় ঘণ্টা দুয়েক সময় কাটাল সেখানে। একেবারেই অনর্থক...আর সেই দুটি ঘণ্টার মধ্যে অধিকাংশ সময় নিযুক্ত হল তীক্ষ্ণ দৃষ্টির নিপুণ ব্যবহারে।

ইউজিন যখন দেখল, একটি মুহূর্তের জন্যেও সে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছে না—স্টিপানিডা যখনি আসছে চোখের সামনে, তার আত্মার সমূহ ক্ষুধা একটি তির্যকরেখায় গিয়ে নিবদ্ধ হচ্ছে স্টিপানিডার মুখপানে, তার লোলুপ দৃষ্টি যেন আদর বুলিয়ে দিচ্ছে সারা গায়ে, যেন লেহন করে নিচ্ছে স্টিপানিডার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গির সুপরিচিত মাধুরী, সুঠাম দেহশ্রীর উন্মাদক লাবণ্য, তখন ইউজিন বুঝল, সে গেছে—জন্মের মতোই গেছে।

তার উদ্ধারের আর কোনো আশাই নেই...আবার ঘনিয়ে উঠবে সেই দারুণ বিভীষিকার কৃষ্ণ মেঘ। জাগবে ঝড়, দুলবে মন ভ্রূ-কুটিল দ্বিধায়, সন্দেহ-দোলায়। হৃদয় বানচাল হয়ে ভেসে যাবে, মাথা কুটে মরবে অস্থির উন্মাদনায়। আবার শুরু হবে সেই শ্বাসরোধ-করা ভয় আর উত্তেজনা, প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের দুঃসহ আত্মধিক্কার—মানসিক যন্ত্রণা আর বিক্ষোভ। এই দুরন্ত কামনা আর নিরন্তর গ্লানি—এদের হাত থেকে রক্ষা পাবার কোনো উপায় নেই ইউজিনের।

যা ভয় করেছিল ইউজিন, হলও তাই।

এমনি দূরদৃষ্ট তার, প্রত্যাশিত বিপদ যেন আগ বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় ইউজিন এসে দাঁড়াল স্টিপানিডার কুটিরের পিছন দিককার পোড়ো জমিটার ধারে। আশ্চর্য! কেমন করে সে-যে পৌঁছুল গিয়ে ঠিক জায়গাটিতে, সে নিজেই জানে না। যেন আর কারুর পা, মন্ত্রবশে চালিত হয়েছে। নিয়তির অভ্রান্ত নির্দেশে বিভ্রান্ত ইউজিন দাঁড়াল এসে স্টিপানিডার কুটিরের পিছনে। পোড়ো জমিটার একপাশে শুকনো ঘাস রাখার সেই পুরানো কুঁড়েঘরটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখা যাচ্ছে সন্ধ্যার আবছায়ায়। এখানেই শরতের এক মধুর অপরাহ্ণে তারা একদিন মিলিত হয়েছিল। স্পষ্ট মনে পড়ে ছবিটা....কোমল, করুণ বিকালের অপরূপ আলোয় ভরে গেছে আকাশ। একটু একটু করে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। সব মনে পড়ে ইউজিনের, আর মর্মর-স্তম্ভের মতোন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—কিসের প্রত্যাশায় !

হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পায় ইউজিন।

সন্ধ্যার অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে আসে। ইউজিন এদিক-ওদিক একটু পায়চারি করবার ভান করে। তারপর থমকে দাঁড়িয়ে একটা সিগরেট ধরায়।

সিগরেট ধরাবার সময় দেশলাইয়ের আলোয় ইউজিনের মুখখানা দেখা যায় কিছুক্ষণের জন্যে।

প্রতিবেশিনী এক কৃষক রমণী দেখতে পায় ইউজিনকে। দেখেই চিনে ফেলে। ইউজিনও তাড়াতাড়ি সন্ত্রস্ত হয়ে পিছন ফিরে দাঁড়ায়। কানে আসে ঐ রমণীটির কণ্ঠস্বর, পাশেই আরেকজন কাকে যেন বলছে :

'যা না,—বাবু তোর জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন। কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন...আ মর, রকম দেখো মেয়ের ! আমি মিছে কথা বলছি নাকি ? বিশ্বাস না হয়, ঐদিক পানে চেয়ে দ্যাখ। দাঁড়িয়ে আছেন এখনো—যা এইবেলা !'

দূর থেকে দেখতে পেল ইউজিন, একজন স্ত্রীলোক—হ্যাঁ স্টিপানিডাই বটে—ঝাঁ করে বেরিয়ে এল। ছুটে গেল ছাউনি-ঘরটার দিকে...।

ইউজিনও পা বাড়াল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে দেখা হয়ে গেল এক চাষির সঙ্গে...।

আর এখন যাওয়া চলে না। আরেকজনের চোখের সামনে দিয়ে যাওয়া সত্যিই অসম্ভব..অগত্যা বাড়িমুখো ফিরতে হল ইউজিনকে।

বাড়ি ফিরে এসে ড্রয়িংরুমে ঢুকল ইউজিন।

কিন্তু কী আশ্চর্য ! ঘরে ঢুকে তার মনে হল, কেমন যেন থমথমে ভাব। সবকিছু তার কাছে অদ্ভুত, অস্বাভাবিক ঠেকতে লাগল..এ-রকম তো আগে হয় নি।

আজই সকালে যখন ঘুম থেকে উঠেছিল ইউজিন, শরীরটা ছিল বেশ ঝরঝরে। মনও ছিল তাজা। কোনো দুর্বলতা ছিল না। বরঞ্চ ঘুম থেকে উঠে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, ওসব দুর্বলতাকে আর সে কোনোমতেই প্রশ্রয় দেবে না, প্রলোভনের ধার-কাছ দিয়েও ঘেঁষবে না, অর্থাৎ মনের কপাট এমন জোরে বন্ধ করে দেবে—যাতে ওসব চিন্তা কোনো ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করতে না পারে।

কিন্তু সব ঝেড়েঝুড়ে সাফ করে দেওয়া সত্ত্বেও আবার একটু একটু করে জঞ্জাল জমে ওঠে। ইউজিন নিজেই ভালোভাবে লক্ষ করে নি, কেমন করে আবার সেই আবর্জনা ধীরে ধীরে জড়ো হচ্ছে। ব্যাপারটা অলক্ষিতে ঘটতে থাকে। ইউজিনের অজ্ঞাতসারে কী যেন একটা প্রভাব আস্তে আস্তে ছড়িয়ে যায় মনের ওপর। সকালে উঠেছিল যে, সে এক মানুষ। আর যে-মানুষ বাড়ি ফিরে এল, সে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি। রূপান্তর বিস্ময়কর হলেও ঘটেছে ইউজিনেরই অসতর্ক মুহূর্তে।

যে-মানুষ কাজ নইলে বাঁচে না, কর্মঠ আর পরিশ্রমী,—সে আজ অকারণে এতটা সময় শুধু শুধু মিছে অছিলায় নষ্ট করে এল ? ইউজিন ভাবে আর আশ্চর্য বোধ করে। সারাটা সকাল আজ সে কী করেছে... ? শুধু যে কাজে তার আঠা ছিল না, তাই নয়, কাজ সে এড়িয়ে গেছে। যে-জিনিস তার কাছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, অনলস পরিশ্রম—সেটা আর দিন-যাপনের অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে হচ্ছে না।

আগে ছিল কাজেই আনন্দ, শান্তি আর স্ফূর্তি। এখন মনে হয়—ওটা অর্থহীন, গতানুগতিক পুনরাবৃত্তি। তাই ধীরে ধীরে একটা বীতস্পৃহ ভাব, একটা উদাস আলস্য এসে ইউজিনের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে...একটু একটু করে কাজকর্ম থেকে সে সরে আসে নিজেরই অজানিতে—মুক্ত করে নিতে চায় আপনাকে কারখানা আর ব্যবসার শ্রমসাপেক্ষ দায়িত্ব থেকে...।

ইউজিন ভাবে, নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন আছে—সমস্ত ক্ষণ কাজ আর কাজ, গতানুগতিক ক্রমিক দিনের শৃঙ্খলায় নিয়ত আবদ্ধ থেকে-থেকে মানুষের মন কর্মচক্রে পিষ্ট হয়ে যায়। মনের সজীবতা লুপ্ত, নষ্ট হয়ে যায়। ভাববার অবকাশ মেলে না, উদ্ভাবনী-শক্তি যায় ফুরিয়ে।

www.BanglaBook.org

তাই ইউজিন নিজেকে গুটিয়ে নিল, মুক্ত করে নিল সকল রকমের কাজ থেকে। বেশিরভাগ সময়ই কাটাত একলা-একলা। কিন্তু নির্জন অবসরের মধ্যেও মনের শান্তি মিলল না। একলা হওয়ামাত্রই ধরল ছটফটানি। বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকা অসম্ভব—মন টেকে না। তাই বাগানে আর বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াত ইউজিন। আর সেইসব জায়গায় চারদিকে এত স্মৃতি ছড়ানো যে, সেখানেও মন স্থির করে কোনো কিছু চিন্তা করা সম্ভব নয়। সেইসব স্মৃতি এসে মনকে ছেঁকে ধরে, গুরুভার হয়ে বুকের ওপর চেপে বসে। কোনো দিকেই ছাড়ান নেই। এক-একটি দৃশ্যের সঙ্গে এক-একটি চিত্র জেগে ওঠে। একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ ধরনের অনুভূতি স্পন্দিত হতে থাকে। আসে আনুষঙ্গিক কামনা আর দুঃসহ অশান্তি।

ইউজিন বুঝতে পারে সবই। এই যে চারদিকে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাঠে আর বাগানে, কাজকর্ম ছেড়েছুড়ে, সকলের সংস্রব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একলা আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভাবছে একটা-কিছু জরুরি বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তা করছি, আসলে তা সত্যি নয় একেবারেই।

ইউজিন কিছুই এমন গভীর দরকারি কথা নিয়ে মনে মনে আলোচনা করছে না। যা করছে, সেটা নিতান্তই অহেতুক, অযৌক্তিক কামনা। একটা মস্ত পাগলামি, অধীর ছেলেমানুষি তার সারা হৃদয়-মন জুড়ে বসে আছে। উগ্র কামনার একটি বিরাট লেলিহান শিখা তার সমস্ত চৈতন্য, সমস্ত সত্তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। ফলে ইউজিন হারাচ্ছে তার বোধ-শক্তি, চিন্তাধারার স্বাধীন স্বচ্ছন্দ গতি। কোনো দ্বিতীয় চিন্তা, অন্যতর প্রসঙ্গের অবকাশ নেই সেখানে। কেবল আছে একটা অস্থির উন্মাদনা, একটি যুক্তিহীন অসঙ্গত প্রত্যাশা। ইউজিন প্রত্যাশা করছে—ইচ্ছাশক্তির বলিষ্ঠ প্রয়োগে এই প্রত্যাশা করছে মনে মনে যে, একটা পরমাশ্চর্য দৈব ঘটনা কি এই মুহূর্তে তার জীবনে ঘটতে পারে না! কোনো এক অকল্পনীয় উপায়ে যদি সে আন্দাজ করতে পারত, ইউজিন তার দৈহিক উপস্থিতি কী একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রার্থনা করছে এই সময়টাতে, আর বেতারে মনের খবর জেনে ফেলে সহসা সে উদয় হত ইউজিনের চোখের সামনে, ঠিক সেই মুহূর্তে। তারপর তারা দু-জনে চলে যেত এমন এক জায়গায়, যেখানে কারু দৃষ্টি পৌঁছায় না। কিংবা যদি সে আসত নীরব অন্ধকার রাত্তিরে, যখন আকাশে চাঁদ নেই—কেউ কাউকে চিনতে পারে না—এমনকি, সে-ও নিজেকেই দেখতে পায় না,...এমনি ঘন আঁধারে যদি সে আসত কাছে, ইউজিন তার দেহ স্পর্শ করত...।

'হায় রে! এর নাম সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা!' ইউজিন মনে মনে ভাবে। 'যেন ইচ্ছা করলেই কাটান-ছেঁড়ান করা যায়! ভেবেছিলুম—দরকার শেষ হলেই, বাঁধন কেটে বেরিয়ে আসব। প্রয়োজন ঘটেছিল স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিরে...একটি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন নীরোগ মেয়ের! প্রয়োজন তো মিটে গেছে বহু দিন, তবে...? তাহলে দেখা যাচ্ছে, এসব ব্যাপার নিজের করতলগত নয়, নইলে কিসের জন্যে এই দীন লোলুপতা?'

অনেকটা সুস্থ ও স্থির মনেই ইউজিন বিচার করতে বসে আপনাকে।

'নাহ্—দেখছি, এইভাবে আর চালানো অসম্ভব, অন্তত ঐরকম স্ত্রীলোকের সঙ্গে! আগুন নিয়ে খেলা চলে না। ভেবেছিলুম—আমিই বুঝি ওকে গ্রহণ করেছি, রেখেছি। এখন দেখছি, ওই আমায় পেয়ে বসেছে, বেঁধে রেখেছে...ওর হাত থেকে ছুটি-ছাড়ান নেই! কী আশ্চর্য! ভেবেছিলুম, আমি তো স্বাধীন....কোনো পিছুটান নেই আমার! কিন্তু নিজেকে প্রতারণা করেছি বিয়ে করবার সময়ে—আপনাকে মুক্ত ও স্বাধীন কল্পনা করে নিজেকেই স্তোক-আশ্বাস ভুলিয়েছি। সেই নিদারুণ আত্মবঞ্চনার ফল এখন ভোগ করতে হচ্ছে! যেদিন ওকে প্রথম পেয়েছিলুম, সেইদিন থেকেই আমার মনের পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। থেকে-থেকে মনের মধ্যে জেগে উঠত কেমন যেন একটা নতুন ধরনের অনুভূতি—সত্যিকারের স্বামী হওয়ার অভিজ্ঞতা। এখন দেখছি, ওর সঙ্গে বাস করাই আমার উচিত ছিল...।'

মনের কাঠগড়ায় এই অন্তহীন জিজ্ঞাসাবাদ, বিশ্লেষণ আর বিচারের ফলে ইউজিন কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। মুখোমুখি প্রশ্ন করে নিজেকে :

'এইভাবে দুই নৌকায় পা দিয়ে ভেসে চলা অসম্ভব। একটা শেষ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছানো

www.BanglaBook.org

দরকার...।

'দুটি জীবনের একটি মাত্র সম্ভব। সেই একটিকেই বেছে নিতে হবে আমাকে, স্থির মনে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে। হয় লিজার সঙ্গে জড়িত হয়ে যে-জীবনযাত্রা একদা শুরু করেছিলুম, সেইটি...তা হলে একদিকে দেশ ও দশের সেবা, আমার আদর্শ কর্মপদ্ধতি...সম্পত্তি-রক্ষা, নিয়মিত জমিদারি পরিচালনা আর আমার গার্হস্থ্য জীবন...আমার নবজাত সন্তান, তাকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা...আর প্রজাদের কাছ থেকে সম্মান ও শ্রদ্ধা পাওয়া...যদি এই জীবনকেই আঁকড়ে ধরি, তাহলে স্টিপানিডার সেখানে থাকা চলে না...কোনো স্থান নেই তার এই নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে। তাকে দূরে কোথাও সরিয়ে দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। কিংবা জন্মের মতোন তাকে লোপাট করে দিতে হবে—যাতে তার আর কোনো অস্তিত্ব না থাকে, কোনো দিনের জন্যে আর আমাকে দ্বিধাগ্রস্ত, পীড়িত ও উদ্বিগ্ন না হতে হয়...

'নয় তো তাকে নিয়েই জীবন। এইটিই দ্বিতীয় পথ...আর অন্য কোনো উপায় নেই। তাহলে স্টিপানিডাকে ওর স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হয়, টাকা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করতে হয়। তারপর স্বামীর অঙ্কচ্যুত করে, জনমত গ্রাহ্য না করে, সমস্ত লজ্জা আর অপমান বরণ করে শালীনতা আর আত্মসম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে, স্টিপানিডাকে নিয়ে একত্র বাস করতে হয়...একদিকে সমাজ আর বাইরের জগৎ, আর-একদিকে আমি ও স্টিপানিডা—সে সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির স্থান নেই।

'কিন্তু সে ক্ষেত্রে লিজার অস্তিত্ব লোপ হওয়া দরকার। লিজা বেঁচে থাকলে কিংবা বাচ্চা মিমিটা থাকলে এই দ্বিতীয় জীবনযাপন করা কী করে সম্ভব হয়? নাহ্—ঠিক তা নয়! বাচ্চা বেঁচে থাকলে কিছু এসে যায় না...কিন্তু লিজা...? লিজার থাকা চলে না, কোনোমতেই নয়। তার চলে যাওয়া দরকার...সে সব কথা জানুক, আমায় অভিশাপ দিক। তারপর চলে যাক, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক...।

'হ্যাঁ, লিজাকে জানতে হবে—তার জানা যে বিশেষ প্রয়োজন—যে আমি তার স্বামী হয়ে, তার সন্তানের পিতা হয়ে, জৈব আকর্ষণের উন্মাদ মোহে তাকে এক নগণ্য কৃষক রমণীর পায়ের কাছে বলি দিচ্ছি...বিবাহিত ধর্ম-পত্নীর বদলে নির্বাচন করে নিলুম যৌন-সঙ্গিনীকে...লিজা জানুক আমি শঠ লম্পট, পাপিষ্ঠ প্রতারক, তার বেশি কিছু নয়...।

'না—না, সে সম্ভব নয়...এমন সাংঘাতিক সত্য কেমন করে মেনে নেওয়া যায়? কিন্তু যদি আর-একটা অঘটন ঘটে যায় ইতিমধ্যে...এমনও তো হতে পারে...।'

ইউজিন আকুল হয়ে, সর্বস্বান্ত দেউলিয়ার মতো মরিয়া স্বপ্ন দেখতে বসে :

'হয় না যে, তা নয়...মনে করা যাক, লিজার সাংঘাতিক অসুখ হল। সেই ভীষণ মারাত্মক পীড়ার কবল থেকে মুক্তি নেই। লিজার প্রাণ-বিয়োগ ঘটল...হ্যাঁ—তাই! লিজা যদি মারা যায়, তাহলে নিশ্চিন্ত! সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যায় এক নিমেষে...।'

'চমৎকার। কী মধুর যুক্তি-কল্পনা! উহ্—এতদূর অধঃপাতে গেছি আমি যে, সুস্থ মস্তিষ্কে, নিপুণ বিচারশীল মনে লিজার মৃত্যু কামনা করছি...?

'না—না, তা হতে পারে না...হয়ে কাজ নেই। যদি মরতেই হয় কাউকে, তাহলে স্টিপানিডাই মরুক! মরুক না কেন? ওর বেঁচে লাভটা কী...? ও যদি জন্মের মতো সরে যায় জীবন থেকে—তাহলে কী আরাম। আমি মুক্ত, চিরজীবনের জন্যে মুক্ত...

'হ্যাঁ—এভাবেই তো মানুষ নামে সর্বনাশের শেষ ধাপে...বিষ খাওয়ায় কিংবা অন্য কোনো উপায়ে মেরে ফেলে তার স্ত্রীকে অথবা প্রণয়িনীকে। তাই ভালো...একটা রিভলভার নিয়ে ওকে ডাক দেওয়া যাক। ও বেরিয়ে আসুক...তারপর বাহুবন্ধনে বেঁধে ফেলার আগেই ওর শাদা বুকের ঠিক মাঝখানটিতে একটা গুলি ছুড়ে সব শেষ করে দেওয়া যাক...থাক সব চুকে-বুকে।...

'সত্যি—ওর মধ্যে যেন শয়তানি জাদু আছে...না, শুধু মায়াবী নয়, পুরোপুরি খাঁটি শয়তান ও—আমায় পেয়ে বসেছে—আমার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি জয় করে আমায় বশীভূত করে ফেলেছে—মনের দৃঢ়তা আর একটু নেই...ওর সামনে আমি দুর্বল, অসহায়....'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

[গল্পের উপসংহার এইখান থেকে আরম্ভ। উপন্যাসের শেষ অংশটি টলস্টয় আর-এক ভাবেও লিখে গেছেন। বিকল্প উপসংহারটি পাঠান্তর হিসেবে গ্রন্থশেষে মুদ্রিত হল]

'তা হলে, মেরে ফেলব? হ্যাঁ—মারতেই হবে। মাত্র দুটি পন্থা রয়েছে—আর তৃতীয় পথ নেই...হয় লিজাকে মেরে ফেলতে হয়, নয়তো ওকে...কেননা, এভাবে বেঁচে থাকা অসম্ভব...জড় দেহ, ভগ্ন মন, আর পঙ্গু ইচ্ছাশক্তি নিয়ে তিলে তিলে এক দুর্ধর্ষ মায়াবীর কবলে গিয়ে পড়ার কোনো মানে হয় না—না, সে হয় না...ওরকম ঘৃণ্য, জীবন্মৃত, রাহুগ্রস্ত হয়ে বেঁচে থাকা অসহ্য....।

'না, সে অসম্ভব। ব্যাপারটা ভালো করে বিবেচনা করতে হবে। ভবিষ্যৎ চিন্তার প্রয়োজন...এখন যেভাবে চলছে, সেইভাবে যদি চলতে থাকে,—মানে, কোনো বিহিত না করি—তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াবে কী রকম, সেটা ভেবে দেখা দরকার।

'যা হবে, তা বুঝতেই পারছি,—নিজেকে আবার সেই এক কথা, পুরানো স্তোক-বাক্য দিয়ে ভোলাতে থাকব যে আমার ইচ্ছে নেই একেবারেই, ওকে ঝেড়ে ফেলব, দূরে সরিয়ে দেব—মনের সম্পর্ক পর্যন্ত রাখব না একদম। কিন্তু ওটা শুধু কথার কথাই, মুখ-সর্বস্ব আশ্বাস মাত্র। সন্ধ্যাবেলায়—অন্ধকার নামতে না নামতেই আবার ঠিক ছুটব—দাঁড়াব গিয়ে ওদের বাড়ির পিছন দিককার ছোট্ট উঠানটায়...ও জানবে, আমি এসেছি...নির্ভুল হাজিরা দিয়েছি—আর তখন নিজে ও বেরিয়ে আসবে...।

'আর যদি লোকে জানতে পারে...? জেনে ফেলে আমার স্ত্রীকে বলে দেয় কিংবা আমিই যদি বলি তাকে, জানিয়ে দিই...কেননা, মিথ্যে কথা আমি বলতে পারব না তো—তা হলে ওর সঙ্গে প্রকাশ্যে থাকতে পারব না, একত্র জীবনযাপন তাহলে অসম্ভব...কী করে সেটা সম্ভব হয়। লোকে জানতে পারবে যে—সবাই জেনে ফেলবে...ঐ পারাশ্যা আর ঐ কামারটা...কেউ আর বাদ থাকবে না—এ-সমস্ত খবর চেপে রাখা যায় না। তা হলে, ওকে নিয়ে একত্র থাকি কী করে?

'অসম্ভব। তা হয় না। দেখছি, শুধু দুটো উপায় আছে আমার সামনে...হয় ওকে, না-হয় স্ত্রীকে মেরে ফেলা...আর নয়তো...হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর একটা পথ আছে, তৃতীয় পথ। আত্মহত্যা...।'

কথাটা অস্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে। ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে উচ্চারণ করে ইউজিন...আর সহসা সারা গায়ে একটা শিহরনের ঢেউ বয়ে যায়...অত্যন্ত ঠাণ্ডা, শিরশিরে কিসের যেন একটা চকিত স্পর্শ...।

'হ্যাঁ—আত্মহত্যা। নিজেকে মেরে ফেললে আর কাউকে মারবার প্রয়োজন হবে না।'

গোপন অন্তর থেকে এই স্বগত উক্তি বেরিয়ে আসে, রূপ নেয় একটা ভয়াবহ কল্পনার। থতমত খেয়ে যায় ইউজিন, একটা অজানা আতঙ্কে চমকে ওঠে। কেননা—ঐটিই যে একমাত্র পন্থা, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। চিন্তাটা ক্রমশই দানা বাঁধতে থাকে...একটা রিভলবার তো আছে তার!

'সত্যিই কি নিজের প্রাণ নিজের হতে খোয়াবো? পারব আমি...সে সাহস আছে আমার? এ-কথাটা তো কখনো ভেবে দেখি নি, সম্ভাবনাও মনে উদয় হয় নি....যদি পারি এমন অবিশ্বাস্য কাজ করতে, তাহলে কী অদ্ভুত ব্যাপার হবে...?'

ভাবতে ভাবতে পড়বার ঘরে ফিরে এল ইউজিন।

একটা নিদারুণ, অস্বস্তিকর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে তার মন। ঘরে ঢুকেই ছোট্ট দেয়াল-আলমারির পাল্লা খুলে ফেলে। ঐ তো রয়েছে রিভলবার...! কিন্তু খাপ থেকে খুলে রিভলবারটা বার করবার আগেই লিজা এসে ঢুকল সেই ঘরে...

২১

ইউজিন তাড়াতাড়ি একখানা খবরের কাগজ দিয়ে রিভলবারটা চাপা দিয়ে ফেলে...পাছে লিজা

www.BanglaBook.org

দেখতে পায়।

'আবার সেই... !' চাপা ভয়ার্ত সুরে চেঁচিয়ে ওঠে লিজা। স্বামীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ, অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সে। চোখের চাহনি তার উদভ্রান্ত। সমস্ত মুখখানা ব্যথায় বিবর্ণ।

'কী আবার সেই... ?' ইউজিন অপ্রসন্ন সুরে জিজ্ঞাসা করে। বিস্মিত, বিরক্ত তার কণ্ঠস্বর।

'আবার সেইরকম বিশ্রী, ভীষণ তোমার মুখের চেহারা... ! সেই যে-রকম আগে তোমার হত...কিছুতেই আমায় বলতে চাইতে না....'

উত্তেজনায় লিজার শ্বাস পড়ে ঘন ঘন। কাছে এগিয়ে এসে বলে :

'কী হয়েছে, বলো না লক্ষ্মীটি ! জেন্যা, দোহাই তোমার, এ-রকম অবস্থা আমি আর চোখে দেখতে পারি না, এ-সহ্য করা যায় না। তুমি খুলে বলো সব কথা। দেখবে, বলে ফেললে মন অনেক হালকা হয়ে যাবে। আমি কি দেখতে পাচ্ছি না, চেপে-চেপে রেখে কত কষ্ট পাচ্ছ? এ-রকম মন গুমরে থেকে-থেকে তোমার স্বাস্থ্য-মন একেবারে নষ্ট হতে বসেছে। তার চেয়ে মন খোলসা করে বলে ফেলা ঢের ভালো,—নয় কি? সে যত বড় দুশ্চিন্তার কারণই হোক, তাকে চেপে রাখলে তোমার খারাপ কি আরো বাড়বে না? ভিতরে ভিতরে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাওয়া কোনো কাজের কথা নয়। একলা, কাউকে ভাগ না দিয়ে, মনের এই বিশ-মণী বোঝা টেনে কতকাল আর বয়ে বেড়াবে, বল? তার চেয়ে আমায় বল, আমি শুনি...তুমি অনেকখানি সান্ত্বনা পাবে, দেখো...'

তারপর একটু থেমে, লিজা কী যেন ভেবে বলল :

'তা ছাড়া, তুমি অকারণে বেশি কষ্ট পাচ্ছ। আমি কি জানি না যে, এমন কিছু খারাপ ব্যাপার নয়... ?'

'তুমি জানো?' অস্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করে ইউজিন। 'কী করে জানলে এমন কিছু নয়? আমার...'

বলতে গিয়ে হঠাৎ পাংশু মুখে থেমে যায় ইউজিন। লিজা আকুল স্বরে বলে ওঠে :

'বলো, বলো ! থামলে কেন? না বললে আমি কিন্তু ছাড়ব না তোমায়...'

বড় করুণ হাসির রেখা ফুটে ওঠে ইউজিনের ওষ্ঠে। বলে :

'বলব? না—না, সে হয় না ! আর বলবারই বা কী আছে? ও কিছু না....।'

শেষ পর্যন্ত পীড়াপীড়ি করলে হয়ত ইউজিন বলতে পারত লিজাকে। কিন্তু সে বলতে পারল না। ঠিক সেই মুহূর্তে মিমি-র ধাত্রী ঘরে এসে প্রবেশ করল। লিজাকে জিজ্ঞাসা করল :

'খুকিকে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসব?'

লিজা বললে : 'হ্যাঁ—নিয়ে যাও।'

তারপর একটু থমকে বললে :

'আচ্ছা, দাঁড়াও। ওর জামা-কাপড় বার করে দিই...ওর মুখ-হাত-পা-ও পরিষ্কার করা দরকার....'

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে স্বামীর দিকে ফিরে তাকায় লিজা। বলে যায় :

'আমি আসছি এক্ষুনি। খুকিকে একটু সাজগোজ করে দিয়ে আসি...তুমি কিন্তু পালিয়ো না যেন—ফিরে এসে শুনব তোমার কথা। না বললে আমি কিন্তু ছাড়ছি না...'

'আচ্ছা, দেখি...তুমি এসো...'

কীরকম অন্যমনস্ক জড়িত স্বরে ইউজিন জবাব দেয়।

লিজা যেতে-যেতে স্বামীর কথাই ভাবে। কিছুতেই ভুলতে পারে না সে—ইউজিনের অপ্রস্তুত, অসহায় মুখখানা। লিজার সনির্বন্ধ অনুরোধ-প্রশ্নের উত্তরে তার মুখে যে ভীরু, কুণ্ঠিত আর করুণ হাসি ফুটে উঠেছিল, সেই হাসিটির কথা বারবারই মনে পড়ে লিজার। দুর্বহ বেদনায় আর অন্তর্দাহে সমস্ত বুকটা থেকে-থেকে টনটন করে ওঠে। এ-কী নিদারুণ, অবর্ণনীয় মনস্তাপ ইউজিনের—যে কাউকে বলতে পারা যায় না, প্রকাশ করতে বাধে? লিজা তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নেয়। ফিরে এসে শুনতে হবেই...ইউজিনের মুখ থেকে কথা আদায় করে নিয়ে তবে সে ছাড়বে।

লিজা যেই ঘর ছেড়ে বাইরে গেল, ইউজিন অমনি তাড়াতাড়ি চোরের মতোন সন্তর্পণে রিভলবারটা তুলে নিল খাপ থেকে।

খুলে পরীক্ষা করে দেখল ইউজিন। বহুদিন আগে গুলি ভরা হয়েছিল এতে, মনে পড়ে। সব-গুলোই আছে, কেবল একটা কার্তুজ নেই। কোথায় গেল, কেন গেল মনে করতে পারল না। রিভলবারটা হাতে নিয়ে ভাবতে লাগল ইউজিন :

'আচ্ছা, কোথায় লাগানো যায়?—মাথায়?'

সঙ্গে সঙ্গে তুলে ধরে রিভলবার। আস্তে আস্তে হাত ওঠে। কপালের এক প্রান্তে, রগের ঠিক কাছটিতে নিয়ে গিয়ে একটু ইতস্তত করে ইউজিন...

একটা দ্বিধা—করব কি করব না—এই ভাব এসে ইউজিনের মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। কী রকম অবশ হয়ে আসে যেন শরীরটা...

কিন্তু তক্ষুনি মনে পড়ে যায় স্টিপানিডার কথা।

আর যেমনি ওর কথা ভাবে ইউজিন, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের মতো খেলে যায় তার দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা। চকিতে ভেসে আসে আবার সেইসব পুরানো চিন্তা, পুরানো দিনের ভয়াবহ গ্লানি—'স্টিপানিডার মুখদর্শন করব না', এই প্রতিজ্ঞা—তারপর সেই দ্বিধা আর দ্বন্দ্বের পালা, সেই রমণীয় প্রলোভন আর নৈতিক অধঃপতন। পদস্খলনের পরে আবার সেই নতুন করে প্রলোভন জয় করবার চেষ্টা—সেই দ্বন্দ্ব-অন্তর্বিরোধের প্রাণান্ত প্রয়াস—ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। আবার সেই দুর্বিষহ জীবন—কল্পনাতেও শরীর ঘর্মাক্ত হতে থাকে।

'নাহ্—তার চাইতে এ-ঢের ভালো—' বলেই রিভলবারের ঘোড়াটা টিপে দেয় ইউজিন।

গুলির আওয়াজে বারান্দার ধাপগুলো একলাফে পেরিয়ে লিজা যেন উর্ধ্বশ্বাসে ঘরের মধ্যে ছুটে এল, ইউজিনের দেহ তখন মাটিতে পড়ে।

উপুড় হয়ে পড়ে আছে, মুখটা মেঝেতে ঠেকে রয়েছে। কানের ওপরে রগ থেকে গরম, কালচে রক্তের স্রোত মুখ বেয়ে মাটিতে নামছে—অজস্র রক্তক্ষরণ হচ্ছে ক্ষতস্থান থেকে। ইউজিনের শবদেহ তখনো থেকে-থেকে কুঞ্চিত হয়ে উঠছে, শরীর তখনো একেবারে নিথর, নিস্পন্দ হয়ে যায় নি...

যথারীতি ময়না তদন্ত শুরু হল এবং যথাসময়ে রায় বেরুল।

ইউজিনের এই আকস্মিক আত্মহত্যার কারণ কেউ ব্যাখ্যা করতে পারল না, খুঁজেও ঠিক করতে পারল না।

মামা মশাই এলেন। কিন্তু তাঁরও মাথাতে ব্যাপারটা ঢুকল না। মাস দুয়েক আগে ইউজিন তাঁকে যে-স্বীকারোক্তি জানিয়েছিল স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তার অবৈধ প্রণয় সম্পর্কে, সেই ব্যাপারের সঙ্গে ইউজিনের আত্মহত্যার মতো বর্তমান শোচনীয় ঘটনার-যে কোনো যোগাযোগ থাকতে পারে, এই অতি সাধারণ নিতান্ত ন্যায্য অনুমানটুকুও তাঁর মগজে এল না।

অবিশ্যি ভার্ভারা আলেক্সিভনার কথাই আলাদা। তিনি বাড়ির সকলকেই বলে বেড়াতে লাগলেন যে, তিনি এই ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হন নি। ইউজিনের অদৃষ্টে-যে এই নিদারুণ পরিণাম নাচছে সে-কথা তিনি বহু পূর্বে থেকেই অনুমান করেছিলেন, স্থির ও নিশ্চিত বলেই জানতেন...যে-মানুষ ওভাবে তর্ক করে, কথা কাটাকাটি করে, তার ভাগ্যে এই পরিণতিই হয়ে থাকে! যা হবে বলে তিনি ভেবেছিলেন, তাই হয়েছে। অতএব আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কিন্তু লিজা আর মেরি পাভলোভনা—কেউই বুঝতে পারেন না ব্যাপারটা, কেন ইউজিন নিজের প্রাণ নিজের হাতে নষ্ট করল। কারণটা খুঁজে পান না কেউই।

কারণ খুঁজে না পেলেও ডাক্তারদের কথা তা বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না, প্রবৃত্তিও হয় না। ডাক্তাররা বলেন, ইউজিনের মাথার গোলমাল হয়েছিল। তার নাকি মস্তিষ্কের বিকৃতিই শুধু

www.BanglaBook.org

হয় নি, হয়েছিল মনোবিকলন—যেটা মনস্তাত্ত্বিকের এলাকার মধ্যে পড়ে।

চিকিৎসকদের এ-সিদ্ধান্ত অবিশ্যি লিজা বা মেরি পাভলোভনা মেনে নিতে পারেন নি। বিশ্বাস করা কঠিন বৈকি! তাঁরা তো জানতেন, চেনাশুনো, আত্মীয়-স্বজন, সকলের চেয়ে ইউজিন ছিল সুস্থ-মস্তিষ্ক, ধীর স্থির এবং স্বাভাবিক। আর সত্যিই তো!

ইউজিনের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, এ-কথাটা যদি স্বীকার করে নিতে হয়ে, তাহলে বলতে হয় প্রত্যেকেই ঐরকম পাগল। জগতের সমস্ত লোকেরই মস্তিষ্ক-বিকৃতি আছে।

যাঁরা অন্য লোকের খুঁত ধরেন, তাঁদের মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিংবা মনোবিকারের লক্ষণ খুঁজে বেড়ান—যে-লক্ষণগুলো তাঁদের নিজেদেরই অবচেতনায় রয়েছে অথচ নিজেরাই দেখতে পান না,—তাঁরাই তো সবচেয়ে বেশি অসুস্থ-চিত্ত। তাঁদের মাথা খারাপই বেশি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উপন্যাসের দ্বিতীয় উপসংহার

'তা হলে মেরে ফেলব? হ্যাঁ, মারতেই হবে। মাত্র দুটি পথই আছে, তৃতীয় পন্থা নেই—হয় স্ত্রীকে মেরে ফেলতে হয়, নয়তো ওকে—এভাবে জীবনধারণ অসম্ভব, বেঁচে থাকা চলে না কোনোমতেই। এ-রকম ঘৃণ্য, জীবন্মৃত, রাহুগ্রস্ত জীবন—অসহ্য...'

ইউজিন আপন মনে কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়, তুলে নেয় রিভলবারটা। পরীক্ষা করে দেখে, ঠিক আছে কিনা—নাহ্, একটা কার্তুজ নেই, কী হল কে জানে?

তারপর রিভলবারটা আস্তে আস্তে পাতলুনের পকেটে পুরে নেয়।

'হায় ভগবান! এ কী করছি আমি?' একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে আসে ইউজিনের কণ্ঠ থেকে। হঠাৎ, হাতজোড় করে ইউজিন প্রার্থনা শুরু করে দেয়। করজোড়ে অদৃশ্য বিধাতাকে উদ্দেশ করে বলে ওঠে—

'হে ঈশ্বর! আমায় সাহায্য কর, বাঁচাও এ সঙ্কট থেকে—উদ্ধার কর! তুমি তো জানো, ভগবান, কায়মনোবাক্যে কোনোদিনই আমি অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে চাই নি—কিন্তু আমি নিঃসহায়, একলা, বড় দুর্বল—শক্তিহীন, ক্রমশ অসমর্থ হয়ে পড়ছি। এই দুর্বার প্রলোভনের সামনে—তুমি আমায় সাহায্য কর, উদ্ধার কর, প্রভু—'

ভক্তিভরে ক্রুস-বিদ্ধ মূর্তির সামনে নত-মস্তক হয়ে দাঁড়ায় ইউজিন—বুকের ওপর দু-হাত দিয়ে ক্রুসের চিহ্ন করে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে।

কিছুক্ষণ পরে যেন ইউজিনের সম্বিৎ ফিরে আসে। চমক ভেঙে যায়, মাথা তুলে চারদিকে তাকায় ইউজিন আর আপন মনেই বলে ওঠে :

'হ্যাঁ—আমি স্থির, সংযত হয়ে থাকতে পারব—সামলাতে পারব নিজেকে। এখন একটু বাইরে বেরিয়ে পড়ি—একটু ঘুরে বেড়িয়ে আসা দরকার। ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা তলিয়ে দেখা দরকার।'

বাইরে বেরুবার আগে ইউজিন নিচেকার হল-ঘরে আগে ঢুকল।

সেখান থেকে ওভারকোটটা তুলে নিয়ে গায়ে পরে নিল। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াল গাড়ি-বারান্দাটার নিচে।

কী আশ্চর্য! নিজেরই অজানিতে ইউজিন হেঁটে চলল সেইদিকেই। তার প্রতিটি পদক্ষেপ কে যেন চালিত করে নিয়ে চলেছে বাগানের পাশ দিয়ে, মেঠো পথ ধরে, ক্ষেত পেরিয়ে ঐ দূরের গোলাবাড়ির দিকে—অভ্রান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলল ইউজিন।

ফসল ঝাড়াইয়ের নতুন কলটার কর্কশ আওয়াজ তখনো থামে নি...ছোকরা ড্রাইভারদের তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা যাচ্ছে দূর থেকে।

ইউজিন গিয়ে ঢুকল গোলাঘরে।

দাঁড়িয়ে আছে সে। গোলাঘরে ঢুকবামাত্র প্রথমে নজরে পড়ল ওকেই। হাতলওলা মস্ত একটা লম্বা কাঁটা দিয়ে ফসলগুলো নেড়েচেড়ে ঘেঁটে দিচ্ছে স্টিপানিডা।

ইউজিনকে দেখতে পেয়েই স্টিপানিডার চোখ খুশিতে চঞ্চল হয়ে উঠল। আর হঠাৎ স্ফূর্তিতে, মেঝেয় ছড়ানো শস্যকণাগুলোর ওপর দিয়ে দৌড়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। ফসল-মাড়াইয়ের কাজে সে-যে কত নিপুণ, সেইটে ইউজিনকে দেখাবার জন্যেই যেন তার উৎসাহ!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্টিপানিডাকে নজর করে দেখবার ইচ্ছে মোটেই ছিল না ইউজিনের। কিন্তু না দেখেও সে পারল না। স্টিপানিডার কাজের প্রতিটি খুঁটিনাটি সে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। আর আড়চোখে এক-একবার লুকিয়ে তাকাল ওর মুখের দিকে।

ইউজিন এতই অন্যমনস্ক ছিল যে, খেয়াল করে নি স্টিপানিডা কখন তার চোখের সামনে থেকে সরে গেছে। হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পায় ইউজিন। আচমকা শরীরটা শিউরে ওঠে।

গোমস্তা এগিয়ে এসে ইউজিনকে সেলাম ঠুকে বললে :

'ঝাড়াইয়ের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল হুজুর! যেগুলো মাড়াই হয়েছে, সেগুলো এখন ঝেড়ে তোলা হচ্ছে। কাজ এখন একটু ঢিমে চলছে, হুজুর। তাই মাল উঠছে কম।'

ইউজিন ঝাড়াই-কলটার দিকে এগিয়ে গেল দেখবার জন্যে। শস্যের গোছাগুলো—যেগুলো সমানভাবে বেঁধে জড়ো করা হয় নি, সেগুলো ড্রামের নিচে এসে মধ্যে-মধ্যে শব্দ করে উঠছে।

ইউজিন মুখ ফিরিয়ে গোমস্তাকে জিজ্ঞাসা করল—

'আর কতগুলো আঁটি আছে এই রকম,—মানে যেগুলো মাড়াই হয়ে গেছে?'

'তা, পাঁচ গাড়ি বোধ হয় হবে, হুজুর...'

'আচ্ছা—তা হলে এক কাজ...'

ইউজিন বলতে গিয়ে কথাটা শেষ করতে পারল না। আবার স্টিপানিডা এল তার দৃষ্টিগোচরে।

ড্রামটার কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে স্টিপানিডা ড্রামের নিচে যে আঁটিগুলো আটকে রয়েছে সেগুলো নেড়ে দিতে লাগল। কাজ করতে করতে পাশ ফিরে তাকায় স্টিপানিডা।

ইউজিন দেখতে পায় তার খুশিতে নেচে-ওঠা চোখ। আনন্দে আর উত্তেজনায় সে-দৃষ্টিতে আছে অন্তরঙ্গ আহ্বানের ইঙ্গিত।

স্টিপানিডার চোখে রয়েছে পুরানো দিনের সেই বেপরোয়া প্রণয়—দায়িত্বহীন, সর্বনাশা মিলনের আকুল আমন্ত্রণ। সে-দৃষ্টির পরিষ্কার অর্থ হল এই :

ইউজিন যে স্টিপানিডাকে এখনো চায়, তার গোপন আলিঙ্গনের কামনা মনে-মনে এখনো লালন করে—সেটা সে বোঝে। স্টিপানিডা জানে ইউজিন এখনো তার পিছনে ঘুর-ঘুর করে বেড়ায়, তারই ছোট কুঁড়েঘরটার পিছনে এসে সেদিন থমকে দাঁড়িয়েছিল স্টিপানিডারই প্রতীক্ষায়... স্টিপানিডা তো রাজিই আছে—বরাবরই সে রাজি—ইউজিনের সঙ্গে থাকতে আবার সে প্রস্তুত, চায় সেই বেপরোয়া অঢেল স্ফূর্তি আর উত্তেজনা। লোকে যা-ই ভাবুক আর ফল যা-ই দাঁড়াক, স্টিপানিডা মোটেই তা গ্রাহ্য করে না।

ইউজিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারে, বেশ অনুভব করতে পারে, যেন তার নিজস্ব শক্তি ক্রমশ কমে আসছে, স্টিপানিডার কবলে আবার সে গিয়ে পড়ছে।

এভাবে আবার আত্মসমর্পণ করতে চায় না ইউজিন। মেরুদণ্ড টান করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ভাবে, 'কিছুতেই রাশ আলগা করব না। মনের লাগাম জোর হাতে টেনে ধরি।'

প্রার্থনা...হ্যাঁ, প্রার্থনার কথাই মনে পড়ে যায় ঠিক এই ক্ষণটিতে। ইউজিন চেষ্টা করে মুখে বলতে...।

আস্তে আস্তে মনে-মনে আওড়ায় প্রার্থনার বাণী। কিন্তু, আর কথা সরে না....জিহ্বায় অস্বাভাবিক জড়তা নামে...বুঝতে পারে ইউজিন তক্ষুনি—ও হবার নয়, কথা থেমে আসে...হাল ছেড়ে দেয় ইউজিন। প্রার্থনা করতে সে পারছে না, ওতে কিছু হবে না—তার মন রয়েছে অন্য জায়গায়।

ইতিমধ্যে একটা মস্ত বড় ভাবনা এসে ইউজিনের মন জুড়ে বসে...

একটিমাত্র চিন্তা—সর্বগ্রাসী পাগল-করা চিন্তা তার সমস্ত হৃদয়-মন অধিকার করে, আচ্ছন্ন করে ফেলে তার সমগ্র চৈতন্যকে।

কেমন করে স্টিপানিডার সঙ্গে বন্দোবস্ত করা যায়—কোথায় ওর সঙ্গে দেখা করা চলে, নিভৃতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এবং সাবধানে—যাতে আর কারুর নজরে না পড়ে। ওর সঙ্গে মিলিত হতে হবেই, উপায় নেই। ইউজিনকে টানছে কোনো এক দুর্বার অদৃশ্য শক্তি।

গোমস্তা হঠাৎ তার মনিবকে জিজ্ঞাসা করল :

'এগুলো যদি আজ শেষ করে ফেলা যায়, তাহলে আজই কি ঐসব নতুন আঁটিগুলো ধরবো ! না কি, আজ কাজ বন্ধ করে দিই,—কাল শুরু করা যাবে ? কী বলেন হুজুর ?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাই হবে।'

অন্যমনস্কভাবে জবাব দিয়ে ইউজিন স্টিপানিডার পিছুপিছু এগিয়ে যায় সেই স্তূপীকৃত ফসলের দিকে। আর পাঁচজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে স্টিপানিডা এখন কাঁটা চালিয়ে সেগুলো ঘেঁটে ঘেঁটে দিচ্ছে।

ইউজিন নিজের মনের সঙ্গে একবার বোঝাপড়ার শেষ চেষ্টা করে :

'আচ্ছা, সত্যি সত্যিই আমি কি দুনিয়ার বার হয়ে গেছি, জাহান্নামে গেছি একেবারে ? নিজেকে সামলাবার মতো একটুও ক্ষমতা আর নেই আমার ? হে ঈশ্বর !...'

বলতে গিয়ে কথাটা আটকে যায় যেন। ইউজিন ভাবে :

'না না, ঈশ্বর এখানে নেই...আছে কেবল শয়তান...প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক নিদারুণ মায়াবী..সে স্টিপানিডা—তার কবল থেকে উদ্ধার নেই আমার। ও আমাকে পেয়েছে—কাঁধে চেপে বসেছে। কিন্তু না—আমি করব না, আমি পারব না। হ্যাঁ, শয়তানই তো—'

নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে এগিয়ে গেল ইউজিন আবার স্টিপানিডার দিকে। পাতলুনের পকেট থেকে ঝাঁ করে রিভলবারটা বার করে ফেলে।

এক...দুই..তিন। পরপর তিনবার ইউজিন গুলি ছোড়ে স্টিপানিডার পিঠ লক্ষ করে। স্টিপানিডা দু-পা দৌড়ে যায় কিন্তু আর পারে না....উঁচু করে রাখা ফসলের স্তূপের ওপরই মুখ গুঁজে পড়ে।

'আহা ? এ কী হল ? ওমা এ কী কাণ্ড ?'

সমবেত স্ত্রীলোকদের ভয়ার্ত চিৎকার গোলাবাড়ি সরগরম হয়ে উঠল।

'না—অ্যাকসিডেন্ট নয়। হাত ফসকে গুলি বেরোয় নি।' ইউজিন বেশ জোর গলাতেই বলে :

'ওকে আমি ইচ্ছে করে মেরে ফেলেছি—হ্যাঁ, খুন। দারোগার কাছে খবর পাঠাও তোমরা !'

বেশ সুস্থ সহজভাবেই বাড়ি ফিরল ইউজিন। কারু সঙ্গে একটিও কথা বলল না ইউজিন। লিজার সঙ্গেও না। কোনো বাক্যালাপ না করে পড়বার ঘরে গিয়ে ঢুকল ইউজিন। ভেতর থেকে খিল এঁটে দিল।

ঘরের ভেতর থেকেই দরজার ফাঁকে মুখ দিয়ে ইউজিন চেঁচিয়ে জবাব দিল লিজাকে। লিজা এসে ধাক্কা দিচ্ছিল। কিন্তু ইউজিন দরজা খুলে দিল না। শুধু ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বলে দিল :

'আমার কাছে এসো না...তুমি...না, কোনো দরকার নেই কথা বলবার। পরে সবই জানতে পারবে....'

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে ইউজিন ঘণ্টি বাজাল। একজন চাকর আসতে ইউজিন উঠে দরজা খুলে দিল।

'যা—গিয়ে খবর নিয়ে আয় স্টিপানিডা বেঁচে আছে কিনা।'

চাকর খবরটা ভালোভাবেই জানত। মনিবকে জানাল, 'ঘণ্টাখানেক আগে সে মারা গেছে।'

'বেশ ! তাহলে যা এখান থেকে। ঘরে যেন কেউ না ঢোকে। দারোগা কিংবা ম্যাজিস্ট্রেট যখন আসবে, আমায় খবর দিস—'

সেদিন এইভাবেই গেল।

পরের দিন সকালবেলায় দারোগা আর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসে হাজির হলেন। তাঁদের সঙ্গে ইউজিনকে যেতে হল হাজতে। যাবার আগে লিজা আর শিশুকন্যার কাছে বিদায় নিয়ে গেল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইউজিন।

যথারীতি বিচার শুরু হল ইউজিনের। এটা যে সময়কার কাহিনী, তখন সবে জুরির বিচারের প্রথম আমল।*

বিচারের ফলে সিদ্ধান্ত হল, ইউজিন সাময়িক উন্মাদনার বশে এ-কাজ করে ফেলেছে। তাই হাকিমের রায় অনুসারে ইউজিনকে গির্জায় থেকে অনুতাপ-দণ্ডে দণ্ডিত করা হল।

ইউজিন প্রথমদিকে প্রায় ন-মাস ছিল গারদে। তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হল এক মঠে। সেখানে একমাস আটক রাখা হল।

জেলে থাকতেই ইউজিনের বদ-অভ্যাস শুরু হয়েছিল মদ খাওয়ার। মঠে এসেও ইউজিন সে-অভ্যাস ছাড়তে পারল না। সেখানেও সমানে মদ্যপান চলতে লাগল।

ইউজিন যখন ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরে এল, তখন সে পুরোপুরি নেশাখোর। অত্যধিক সুরাপানের ফলে দুর্বল দায়িত্বহীন মাতালে পরিণত হয়ে গেছে ইউজিন।

ভার্ভারা আলেক্সিভনার অবিশ্যি কোনো পরিবর্তন হয় নি। তিনি যেমন ছিলেন আগে, এখনো ঠিক তেমনি আছেন। দৃঢ়কণ্ঠে তিনি সকলকে জানিয়ে দিলেন তাঁর স্থির নিশ্চিত বিশ্বাসের কথা। তিনি তো অনেক আগে থেকেই জানতেন, ইউজিনের এ-অবস্থা হবেই। যেভাবে সে অকারণ তর্ক চালাত, অবাধ্য কোপনস্বভাবের জন্যে কথা কাটাকাটি করত, তাই থেকে ভার্ভারা আলেক্সিভনা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইউজিনের অদৃষ্টে এইরকম পরিণতি তোলা আছে। যা হবে বলে তিনি অনুমান করেছিলেন, তাই হয়েছে।

কিন্তু মেরি পাভলোভনা কিংবা লিজা—কেউই বুঝতে পারে নি ব্যাপারটা, কেন ইউজিন এ-রকম কাজ করে বসল। কারণটা কারুর মাথায় ঢোকে নি।

কারণ বুঝতে না পারলেও ডাক্তারদের কথা তা বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না, প্রবৃত্তিও হয় না। ডাক্তাররা বলেন, ইউজিনের মাথার গোলমাল হয়েছিল। তার নাকি শুধুই মস্তিষ্ক বিকৃতি হয় নি, হয়েছিল মনোবিকলন, যে-ব্যাধি মনস্তাত্ত্বিকের এলাকায় পড়ে।

চিকিৎসকদের এই সিদ্ধান্ত অবিশ্যি লিজা বা মেরি পাভলোভনা মেনে নিতে পারেন নি। বিশ্বাস করা কঠিন বৈকি! তারা তো জানতেন, চেনাশুনো আত্মীয়-স্বজনের সকলের চেয়ে ইউজিন ছিল অনেক বেশি সুস্থমস্তিষ্ক, ধীরস্থির ও প্রকৃতিস্থ।

আর সত্যিই তো!

ইউজিনের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, এ-কথাটা যদি স্বীকার করে নিতে হয়, তাহলে বলতে হয়, প্রত্যেকেই ঐরকম পাগল! জগতে সমস্ত লোকেরই তাহলে মস্তিষ্ক-বিকার আছে।

যাঁরা অন্য লোকের মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিংবা মনোবিকারের লক্ষণ খুঁজে বেড়ান—যে-লক্ষণগুলো তাঁরা নিজেদের মধ্যে দেখতে পান না—তাঁরাই তো সবচেয়ে বেশি অসুস্থচিত্ত। তাঁদেরই নিশ্চয় মাথা খারাপ।

ইয়াসনায়া পোলিয়ানা
১৯ নভেম্বর ১৮৮৯

লিও টলস্টয়

BanglaBook.org

* [১৮৬৪ সালে রাশিয়ার জুরি প্রথার প্রবর্তণ হয়। তাই গোড়ায় জুরিরা আসামীদের শাস্তি বিধানে কোনো রকম কঠোরতা অবলম্বন করতো না। হালকা শাস্তি দিয়েই ছেড়ে দিত।]